# নীহারের মা

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস
১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

যে মা বাস্তব জগতের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক-তাপ, দুঃখ বেদনায় ক্ষত বিক্ষত হইয়াও নিরন্তর সন্তানকে নিবিড়ভাবে অন্তরের সান্নিধ্যে টানিতেছেন, যে মা-র অপার করুণায় আমার সকল সত্ত্বা আজ পরিস্ফুট ; সেই করুণাময়ী মা-কেই এ-পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

'নীহারের মা' লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত নিখাদে বাঁধা আখ্যায়িকা। ইহা নিছক উপন্যাস পর্য্যায়ভুক্ত না হইলেও, ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ইহাতে যে গভীর মাতৃপ্রেমের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে ভাবালুতার আবেগ থাকিলেও, বক্তিগত প্রাণধর্ম্মে তা সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

—প্রকাশক

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৪৬

অনেক ডাকাডাকি করিয়াও মা যখন ডলির সাড়া পাইলেন না, তখন তিনি সরাসরি একেবারে নীচে নামিয়া আসিলেন—বলি হ্যাঁরে ডলি, ডেকে ডেকে যে আমার গলা চিরে গেল, তোর কি এতটুকু হুঁস নেই? সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই ডলি বলিল—কেন, কি হয়েছে কী? এইত আসছি তোমার কাছ থেকে। মা ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এখন তোর সেলাই ফোঁড়াই রেখে ধরবি আয় দেখি মেয়েটাকে একটু। রাগে গরগর করিতে করিতে ডলি উঠিয়া আসিয়া মার কোল হইতে তার ছোট বোনটিকে সজোরে ছিনাইয়া লইল। মা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁরে, কচি মেয়েকে অমন করে কেউ কোলে নেয় নাকি? ডলির কোল হইতে ছায়াকে ছিনাইয়া লইয়া মা বলিলেন,—যা কিছু করতে হবেনা তোকে। দূর হয়ে যা এখান থেকে। নিঃশব্দে ডলি চলিয়া গেল। অভিমানে তাহার দুই চোখ তখন বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের প্রতি রূঢ় ব্যবহারে সে অনভ্যস্ত। মাকে সে ভালবাসে। কিন্তু আজ কেন যে খপ করিয়া তাহার রাগটা বাড়িয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অনুশোচনার এক সূক্ষ্ম বেদনায় তাহার দুই চক্ষে জল আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিতান্ত নিরীহের মত সে সিঁড়ির এক পাশে গিয়া বসিল।

# নীহারের মা

নিঃশব্দে মা যে কখন তার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তা সে জানিতেই পারিল না। মা বলিলেন—কি-ইবা তোকে বলেছি মা। নে ওঠ্ রেখাকে ডেকে নিয়ে খাবি আয়, সেই কোন সকালে খেয়েছিস। মায়ের গলার স্বরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নিঃশব্দে ডলি উঠিয়া গেল।

রেখা তখন পাড়ার একপাল মেয়ে জুটাইয়া ছাদের উপর লুকোচুরি খেলিতেছিল। ডলি গিয়া দাঁড়াইতেই তাহাদের খেলা বন্ধ হইয়া গেল। ডলি বলিল—নে খেলা রেখে এখন খাবি আয় দেখি। বিরক্ত হইয়া রেখা বলিল—এখন আমি যেতে পারব না।

মা ডাকচে যেতে পারবিনা কি রকম ?

—না খাব না, তোমার কি ?

ডলির পিছনে পিছনে মা ছাদে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। মুখের ওপর জবাব শুনিয়া তিনি আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। রেখার পিঠে ঘা-দুই চার বসাইয়া দিলেন। দুই চোখ ঠেলিয়া রেখার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মায়ের পিছু পিছু সে নীচে নামিয়া আসিল। নীচে আসিয়া মা নরম হইয়া বলিলেন, হ্যাঁরে তোরা যদি এমনি করে ঝগড়া করিস, তাহলে কোথায় যাই বল্ দেখি! কিছুক্ষণ থামিয়া মা আবার বলিলেন—মা তোদের নিয়েই যে আমার সব ; তোদের যদি জোর করে দুটো কথা না বলি তো কাকে বল্‌ব বল্! বলিতে বলিতে মায়ের গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল। রেখা ও ডলি তখন মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়াছে। মায়ের মন। স্নেহের উৎস যে কোথা হইতে কেমন করিয়া বাহির হইয়া বিশ্বসংসার প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ভৃত্য কল্পনাথ আসিয়া খবর দিল নীচে মাষ্টার মহাশয় বসিয়া আছেন।

রেখা ও ডলি চোখ মুছিতে মুছিতে বই লইয়া চলিয়া গেল। রেখার মুখের দিকে চাহিয়া নীহার আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—এ্যা, কেঁদে কেঁদে যে চোখছুটো ফুলিয়ে ফেলেছ দেখছি। কী হ'ল কি? রেখা হাসিয়া বলিল, কই কিছু তো হয়নি—

নীহার বলিল,—না আবার কি? দুষ্টুমি করেছিলে মা মেরেছেন বুঝি? ঘাড় নাড়িয়া ডলি জানাইল, মাষ্টার মশাই ঠিক্ ধরেছেন। নীহার আবার কি বলিতে যাইতেছিল, মাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া থামিয়া গেল। মা হাসিয়া বলিলেন—কি বাবা, কি বলছিলে বলো তো। মৃদু হাসিয়া নীহার কহিল, কিছু তো বলিনি মা। মা হাসিলেন। খানিক পরে কহিলেন, তোমার ছাত্রীদের ব্যাপার সব শুনেছ বাবা! আজকাল আমার একটা কথা যদি ওরা কানে তোলে। ওদের একটু বুঝিয়ে দিও ত'। রেখা ও ডলির দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া নীহার বলিল—বেশ তো মা; এবার থেকে ওরা কি করে না করে সব আমাকে বলে দেবেন। তারপর রেখা ও ডলির পানে ফিরিয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল—ছিঃ, তোমরা মায়ের কথা শোন না! যে মা তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে তোমাদের মানুষ করেছেন, তাঁর কথা অমান্য করার মত পাপ বোধ হয় আর কিছু নেই।

রেখা ও ডলি মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে মা বলিলেন—সবাই কি ওকথা জানে বাবা। যদি জান্‌ত তাহলে পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু থাকৃত না। ওরা মাকে চেনে না, তাই মাকে ওরা জান্‌তেও পারে না। বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দুটি সন্ধ্যাতারকার মত টলমল করিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া নীহার বলিল, সবায়ের বেলাই ও-কথা সত্যি

কি মা। এমন ছেলেও জগতে আছে, যার অন্তরে মা ছাড়া আর কিছু স্থান পায় না? গভীর এক দীর্ঘশ্বাস নীহারের বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল—

—কিন্তু দুঃখ মা সেই ছেলেরাই স্নেহ-বঞ্চিত—

ম্লান হাসিয়া মা বলিলেন—সে-ও মায়েরই ছলনা বাবা।

—কিন্তু সে ছলনা যে বড় নির্ম্মম, বড় নিষ্ঠুর মা।

বিষণ্ণ-হাসি মায়ের মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, দ্রুতপদে সরিয়া গেলেন।

রেখা হাসিয়া উঠিল—মা যেন কি মাষ্টার মশাই। একটুতেই চোখে জল এসে পড়ে। মা যে কেন সেখান হইতে সরিয়া গেলেন সে বুঝিল একমাত্র নীহারই।

অভিমানের বিপুল বেগ ধারণ করিবার মত শক্তি মার কোথায়? পরকে আপন করিবার ভিতর যে দাবী আছে, সে দাবীর প্রচণ্ডতা অসামান্য।.........

নীহার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পড়ানো তাহার আর সেদিন হইল না। তারপর কোন্ এক সময় যে সে রাস্তায় নামিয়া আসিয়া পড়িল তাহা সে জানিতেও পারিল না। ঘরে আসিয়া নীহার দেখিল তাহার খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। এক টুক্‌রাও সে মুখে তুলিতে পারিল না। এক গ্লাস জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। অজস্র চিন্তা তখন তাহার মাথায় ভীড় করিয়াছে। আজন্ম স্নেহ-বঞ্চিত নীহার আকস্মিক করুণার স্পর্শে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে।

*　　*　　*　　*

মায়ের অন্তরে কোথায় যে এত স্নেহ, এত প্রেম জমা হইয়াছিল আর

কেনই বা তাহা এই অপরিচিত, অজ্ঞাত ছেলেটির উপর আকস্মিক ভাবে ঝরিয়া পড়িল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুদূর অতীতের পানে তাকাইয়া কিসের এক অস্পষ্ট আশার আনন্দে তাঁহার সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ রাত্রির পানে তাকাইয়া তিনি যুক্তকরে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন।

ধরিত্রী!

চমকাইয়া ধরিত্রীময়ী পিছনে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার স্বামী।

অনিলবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি কাঁদচ ধরিত্রী!

অশ্রু গোপন করিয়া ধরিত্রীময়ী বলিলেন—কই না তো—

হাসিয়া অনিলবাবু বলিলেন—লুকিয়ো না ধরিত্রী—

ধরিত্রীময়ী হাসিয়া বলিলেন—সত্যিই বলছি আমার কিছু হয়নি, শুধু শুধু কি কেউ কাঁদে।

অনিলবাবু বলিলেন—যাক্ ওকথা। এখন খেতে দেবে চল দেখি, ক্ষিদেয় যে নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।

ধরিত্রীময়ী বলিলেন,—চলো।

ধরিত্রীময়ীর অশ্রু অনিলবাবুর জীবনে এক আকস্মিক ঘটনা। দুঃখ পাইয়া ধরিত্রীময়ী কাঁদিয়াছেন একথা একদিনও অনিলবাবুর স্মরণ হয় না। তাঁদের সংসার সাধারণ সংসার হইতে কিছু আলাদা। এ সংসারের স্বচ্ছ দিনগুলি কলহাস্যের মত হাল্‌কা-আনন্দে বহিয়া যায়, ভুলচুক এতটুকুও ধরা পড়ে না। সেই সংসারে বেদনার স্পর্শ কিছু আকস্মিক ও অভাবনীয়!···

নীহারের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে:—

# নীহারের মা

নীহারের পিতা বিলাসকুমার ও মাতা ইন্দিরা দেবী তাঁহাদের দূর সম্পর্কের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃবধূকে লইয়া সংসার পাতিয়াছিলেন। সেই সংসারের মাঝে থাকিয়াই নীহার মানুষ হইয়াছে। ছোটবেলা হইতেই নীহারের মন দরিদ্রের প্রতি করুণা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। নিঃস্বার্থ, ভাবপ্রবণ এই ছেলেটির শৈশব হইতেই কোথায় যেন দুঃখের কাঁটা একটা বিঁধিয়া আছে।

কলিকাতার মত জায়গায় একই পাড়ায় বাস করিয়া ব্রাহ্মণ বিলাস-কুমার—ধনী অনিলবাবুর সহিত বিশেষ মেলামেশা করেন নাই। তিনি একজন একরোখা গোছের লোক ছিলেন। শত অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি কাহারও কাছে হাত পাতিতে পারেন নাই। যেমন তেমন করিয়া তাঁহাদের সংসার চলিয়া যাইত। কিন্তু এই দারিদ্র্যের জন্য সংসারে তাঁহাদের কোনোদিন অশান্তি ঘটে নাই, তবে দুঃখ ছিল তাঁহাদের অন্য দিক দিয়া। বিলাসকুমার ও ইন্দিরা দেবীর বিবাহের পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনও তাঁহাদের কোন সন্তান হইল না। দিনের পর দিন উন্মুখ প্রতীক্ষায় স্বামী স্ত্রী অধীর হইয়া উঠিল। কত রাত্রি এই দুইটি প্রাণী দেবতার উদ্দেশে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছে, কত নিষ্ফল অভিমানে তাহাদের চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিয়াছে, কত মানসিক, কত সাধু-সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাতুলী কবচ ধারণ করিয়াছে, তথাপি এই সুদীর্ঘ দিনগুলির ভিতর বাঞ্ছিতের দেখা মিলিল না। ইন্দিরা দেবীর সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা. ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন মিলাইয়া যাইতে বসিল। হায়রে মানুষ! আর তার আশা!......

এমনি করিয়াই দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, এমনি সময়ে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল।

## নীহারের মা

বিলাসকুমার সেদিন নিতান্ত আনমনে রাস্তাদিয়া হাঁটিতেছিলেন এমন সময় এক পাগল আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ঝুলি হইতে একটি শিকড় বাহির করিয়া, বিলাসকুমারের হাতে দিয়া বলিল—তোর স্ত্রীকে এটি খাইয়ে দিস। তার কোন পুত্র সন্তান হয়নি—

বিস্মিতমুখে বিলাসকুমার বলিলেন—তুমি জান্‌লে কেমন করে?

সহাস্যে পাগল বলিল—আমি জানি। এটি তাকে খাইয়ে দিস তাহলেই তোর সন্তান হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মার নামে পূজো দিস। আর যদি ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কোনদিন দেখা করার প্রয়োজন হয় তো কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে খোঁজ করিস।

ভক্তিভরে বিলাসকুমার বলিলেন—কিন্তু বাবার নাম তো জানলুম না, কেমন করে খুঁজব?

পাগল বলিল,—আমার নাম শ্রীনাথ পরমহংস বাবাজী; তারপর খানিক থামিয়া সে আবার বলিল—হ্যাঁ, আর একটা বিষয়ে তোকে সাবধান করে দিই। তোর স্ত্রীকে কিন্তু এসব কথা শোনালে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটবে।

সন্ন্যাসী আর সেখানে একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। নিমেষে কোথায় যেন মিলাইয়া গেল।—

কিছুদিন পরের ঘটনা—

শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর রাত্রি। অবিশ্রান্ত জল-ধারায় রাস্তা ঘাট ভাসিয়া যাইতেছে। রাস্তায় লোক চলাচল নাই বলিলেই হয়। গাড়ী ঘোড়ার ভীড় কমিয়া আসিয়াছে। সমস্ত সহর যেন মরিয়া গিয়াছে।

## নীহারের মা

সহসা একটি পর্ণকুটীর হইতে কান্নার রোল ভাসিয়া আসিল। একটি যুবক রাত্রির সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে একটি সদ্যজাত শিশুকে কোলে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল। সে শিশুটিকে দু'একবার নাড়িয়া চাহিয়া দেখিল সে বাঁচিয়া আছে কিনা, কিন্তু শিশুটির দেহে জীবনের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া আবার সে চলিতে সুরু করিল। গলির মোড়ে আসিয়া সে একবার চমকিয়া দাঁড়াইল। কি যেন ভাবিয়া সে শিশুটিকে সাশ্রুনেত্রে সামনের ডাষ্টবিনে বিসর্জ্জন দিল। পরক্ষণেই হঠাৎ কিসের এক অস্ফুট আর্ত্তনাদে সে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল আর একটি সদ্যজাত শিশু। যুবক হতভম্ব হইয়া গেল,—সে মনে করিল, তাহারই সেই সদ্যজাত শিশু বোধহয় ভগবানের দয়ায় প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে! সস্নেহে সে শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইল।

ইন্দিরা দেবী জানিলেন, তাঁহার একটি পরম সুন্দর পুত্র হইয়াছে।

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সে রাত্রে যে আনন্দের বান ডাকিয়াছিল তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব!

কেহই জানিল না কি ঘটিয়া গেল, জানিলেন শুধু সেই পাগল শ্রীনাথ পরমহংস বাবাজী। তাই তিনি কোথা হতে ছুটিয়া আসিলেন সেই পর্ণকুটীরে। চিনিতে পারিয়া বিলাসকুমার তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া সাধু বলিলেন—তুমি ভুল করেছ বিলাসকুমার। এ শিশু তোমার নয়। তোমার শিশুটি সত্যই মৃত।

তারপর তিনি এই কুড়াইয়া পাওয়া শিশুটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেলেন।

# নীহারের মা

চলিয়া যাইবার সময় সন্ন্যাসী শিশুটির হাতে একটি কবচ বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—এই কবচে শিশুর জন্মবৃত্তান্ত লিখে দিয়েছি। আমি ও এর পিতা ছাড়া এই জন্মবৃত্তান্ত আর সকলের অজ্ঞাত।...

সন্ন্যাসী যেমন আসিয়াছিলেন ঝড়ের মত আবার মিলাইয়া গেলেনও তেমনি এক নিমেষে।

বিলাসকুমার হতভম্ব হইয়া গেলেন, সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার চোখের সামনে একটা অদ্ভুত রহস্যের জাল বুনিয়া দিল। তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।.........

*    *    *    *

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেই শিশু এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। এই যুবকই আমাদের নীহার।

## ২

ভোর হইয়া গিয়াছে। মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ডলি ও রেখাকে ডাকিয়া তুলিয়া, মুখহাত ধুয়াইয়া নীচে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন।

রেখা একটু আপত্তি জানাইয়া বলিল—এত ভোরে মা? তাড়া দিয়া মা বলিলেন—ভোর আবার কি? মাষ্টার মশাই নীচে বসে আছেন তা জানিস।

রেখা আর কোন কথা বলিল না।

রেখা ও ডলি ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল মাষ্টার মহাশয় বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, যেন বর্ষণোন্মুখ।

কখন যে তাহার ছাত্রী দুইটি ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে নীহারের তা খেয়ালই ছিল না। তাহার চমক ভাঙিল রেখার ডাকে।

মাষ্টার মশাই আমার এই ইংরিজিটা বলে দিন না, একটু ভয়ে ভয়েই রেখা তাহার আবেদন জানাইল।

উদাসীন ভাবে নীহার বলিল—আজ থাক্ রেখা, আমার শরীরটা বড় ভাল নেই। তার চাইতে তোমাদের একটা লেখা দিচ্ছি বসে বসে লেখ।

রেখা ও ডলি বিস্মিত হইল। এমন তো কখনও মাষ্টার মহাশয় করেন না!

আজ বহু চিন্তা নীহারের মাথায় জড়ো হইয়াছে।—বারে বারে তাহার মনে পড়িয়া যায় তাহার জীবনের বিষাক্ত ইতিহাসের কথা। একি সত্যি! কেমন করিয়া সম্ভব হইল ইহা! জন্মাবধি যে মা তাহাকে

স্নেহে, প্রেমে, যত্নে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, সে তাহার গর্ভধারিণী নয়! ভাবিতেও আশ্চর্য্য লাগে। নিষ্ফল অভিমানে তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিল।

হঠাৎ নীহার রেখার পানে চাহিয়া বলিল—তোমাদের স্কুলের আজ ছুটি না রেখা ?

হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, আমাদের দিদিমণি বলে দিলেন, কাল তোমাদের ছুটি—তোমাদের ইস্কুলের কাল জন্মদিন—

ওঃ সেই জন্যে ? বেশ বেশ। আজ তোমাদের আমি বেড়াতে নিয়ে যাব। খেয়ে দেয়ে ঠিক হয়ে থেকো।

আনন্দে রেখা লাফাইয়া উঠিল—কোথায় মাষ্টার মশাই ? হাসিয়া নীহার বলিল—সে এখন বল্‌ব না, বললেই সব মজা নষ্ট হয়ে যাবে।

কৌতূহল দমন করা রেখা ও ডলির পক্ষে যেন অসম্ভব হইল। তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কল্পনাথ চা ও খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডলি তাড়াতাড়ি খাবারের থালাটি নীহারের সামনে সাজাইয়া দিল।

সঙ্কুচিত হইয়া নীহার বলিল—এসব আবার কি ডলি ? তোমাদের না আমি বলে দিয়েছি যে রোজ রোজ এসব আনাবে না। তোমরা দেখছি আমার কথা কানেই তোলো না।

শেষের দিকের কথাগুলি নীহার যেন একটু রাগ করিয়াই বলিল।

ডলি একটু অভিমানের সুরে বলিল—বারে, আমায় বকছেন কেন ? মা যদি পাঠিয়ে দেয় তো আমার দোষ নাকি ?

নীহার আর কোন কথা বলিল না। চা ও খাবারের থালাটি সে টানিয়া লইল।

এমনধারা ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটিয়া থাকে। নীহার বিস্মিত হয়, রাগ করে, কিন্তু ইহারা তাহার কোন ওজরই শোনে না। কিসের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে এ-বাড়ীর সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

নীহারের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। থালা লইতে আসিয়া কল্পনাথ বলিল—মাষ্টার বাবু, বাবু আপনাকে ডাকছেন। এখন যেতে পারবেন কি ?

কি ভাবিয়া নীহার বলিল—চল।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া নীহার দেখিল অনিলবাবু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন। নীহারকে দেখিতে পাইয়াই তিনি সাদরে কাছে ডাকিলেন।

অনিলবাবু কথা পাড়িলেন—দেখ নীহার আমরা মনে করছি—কিছুদিনের মধ্যেই দেওঘর যাব, তা তোমার ছাত্রীদের কি ব্যবস্থা হবে বল দেখি ?

নীহার বলিল—বেশ তো। তবে ওদের পড়াশুনা সম্বন্ধে একটু নজর রাখবেন ; আর দেখবেন যেন ওরা সকাল বিকাল একটু বেড়াতে পায়।

অনিলবাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওদের মা বলছিলেন যে তুমি যদি যেতে আমাদের সঙ্গে তো সুবিধে হত বড়।...

নীহার চুপ করিয়া রহিল।

অনিলবাবু পুনশ্চ বলিলেন—কি তোমার অমত আছে নাকি ?

অন্যমনস্ক হইয়া নীহার বলিল—না, আমি যাব।

খুশি হইয়া অনিলবাবু বলিলেন—বেশ, বেশ। তাহলে গুছিয়ে গাছিয়ে নাও তুমি। অনিলবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—আচ্ছা এখন যাও তাহলে তুমি। অনেক বেলা হয়ে গেল।

## নীহারের মা

ধীরে ধীরে নীহার চলিয়া গেল।—

বাড়ীতে আসিয়া নীহার স্নান, আহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছে এমন সময়ে কল্পনাথ গিয়া হাজির হইল তাহার কাছে।

বিস্মিত হইয়া নীহার বলিল—কি খবর কল্পনাথ? হঠাৎ যে—

সহাস্যে কল্পনাথ বলিল—ছোট মা একখানা চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিখানি সে নীহারের দিকে আগাইয়া দিল।

নীহার যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না,—মা তাহাকে চিঠি দিয়াছেন! তাড়াতাড়ি সে খাম খুলিয়া ফেলিল। খামের ভিতর একটি পাঁচ টাকার নোট ও একখানি চিঠি।

মা লিখিয়াছেন ঃ

কল্যানীয় বাবা নীহার,—

কল্পনাথের হাতে এই পাঁচটি টাকা ও চিঠি পাঠাইলাম, তোমার হাত খরচের জন্য। তোমায় আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি, সেই জন্যই আমার এ সাহস। মায়ের এ যৎসামান্য দান যেন ফেরৎ না আসে, এটা আমার আদেশ। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। কল্পনাথের হাতে চিঠির জবাব দিও।

ইতি—

তোমার মা

চিঠিখানি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নীহার বলিল—আচ্ছা তুমি যাও কল্পনাথ। মাকে বোলো তাঁর জবাব আমি পরে দোব।

কল্পনাথ চলিয়া গেল।

বার বার নীহার চিঠিখানি পড়িল। বহুবার পড়িয়াও যেন তাহার

আশা মিটিলনা। কেমন করিয়া সে ইহার জবাব দিবে, সে ভাষা সে কোথায় পাইবে! ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল রেখা ও ডলিকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার কথা। জামা-কাপড় পরিয়া তাড়াতাড়ি সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নীহার যখন অনিলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, রেখা ও ডলি তখন সাজিয়া গুজিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের লইয়া নীহার বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির আনন্দে ডলি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল,—জানেন মাষ্টার মশাই মা বলছিলেন, তোদের মাষ্টার মশাই তোদেরই খালি বেড়াতে নিয়ে যায়, কই আমাকে তো কখনো কোথাও নিয়ে যায় না।

নীহার চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল কোন কথা বলিল না।

ডলি বলিল—মা বলেন, ও আমার আর জন্মের ছেলে ছিল। আর জন্মে আমি ওকে পাইনি, তাই এ জন্মে ভগবান ওকে মিলিয়ে দিয়েছেন। ও যেন আমার সেই হারাণ ছেলে।

নীহার মনে মনে কাঁপিয়া উঠিল। একি সত্যি!

তাড়াতাড়ি সে ওকথা চাপা দিয়া বলিল—থাক্ ওসব কথা ডলি।

ডলি হাসিয়া বলিল—থাক্‌বে কেন মাষ্টার মশাই? মা সেদিন পিসিমাকে বলছিলেন: দেখ ঠাকুরঝি আজ যদি আমার সে ছেলেটি থাকৃত, তাহলে সে ঠিক ঐ নীহারের মত হ'ত। ওর প্রতিটি অঙ্গ যেন আমার চেনা বলে মনে হয়। কি জানি ঠাকুরঝি ওকে দেখলেই আমার মনটা কেমন করে ওঠে। কথার মোড় অন্য দিকে ফিরাইয়া নীহার বলিল—তোমাদের কিন্তু আজ বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে, মা ভাববেন না ত'?

## নীহারের মা

রেখা ও ডলি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—ভাববেন কেন? আপনার সঙ্গে এসেছি।

নীহার আর কোন কথা কহিল না। তাহাদের লইয়া সে বাসে উঠিল। রেখা ও ডলি সেদিন যা ঘুরিয়াছিল, অত বেড়ান বোধহয় তাহাদের ভাগ্যে কোনদিনই যোটে নাই। বেড়াইয়া তাহারা যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয়কে বাহিরের ঘরে বসাইয়া ডলি ও রেখা যখন ভিতরে যাইল, তখন মা তাহাদের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের দেখিতে পাইয়া মা বলিলেন—হ্যাঁরে এত দেরী করতে হয়। আমি যে ভেবে সারা হয়ে গেলাম—

ডলি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—কেন মা, তোমাকে তো বলে গিয়েছিলাম আমাদের দেরী হবে।

এত দেরী করবি তা কি আমি জানি?

ডলি একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—না জান্‌তে তো পাঠিয়ে ছিলে কেন; আমরা মরেও যাইনি, হারিয়েও যাইনি। তাও আবার গিয়েছিলাম মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে।—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—হ্যাঁরে নীহার এসেচে? কোথায় সে?

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন নীহার বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাহিরের ঘর হইতে নীহার সব কথা শুনিতে পাইয়াছিল। এত দেরী করার জন্য সে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই তো, পরের মেয়ে লইয়া বাহিরে যাইয়া এত দেরী করা তাহার ঠিক হয় নাই। কিন্তু—হঠাৎ কি ভাবিয়া নীহার চমকাইয়া উঠিল—মা কি তাহলে তাকে বিশ্বাস

করেন না! ভাবিতেও তাহার অন্তর বিষাইয়া উঠিল। এ বাড়ীর প্রতি সমস্ত বাঁধন তাহার এক নিমিষে যেন আলগা হইয়া গেল।

ডলি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া নীহারকে ধরিল—মাষ্টার মশাই মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

একটু বিরক্ত হইয়া নীহার বলিল—কেন?

চিন্তা করিয়া ডলি বলিল—তাত আমি জানি না মাষ্টার মশাই—

নীহার আর কোন কথা না বলিয়া ডলির সঙ্গে ফিরিয়া গেল।

নীহার গিয়া দাঁড়াইতেই মা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—হ্যাঁ বাবা আমাকে না ব'লে অমন করে চলে যেতে হয়। অমন করলে আমার মনে কত আঘাত লাগে জান বাবা! মা সামলাইয়া লইলেন। ধীরে ধীরে নীহারের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—মার কথায় রাগ করলে নীহার?

নীহারের সমস্ত রাগ কোথায় যেন উড়িয়া গেল। স্নেহের এত নিবিড় স্পর্শে সে উদভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে সে বলিল—মায়ের কথায় কি ছেলে রাগ করে মা। আশীর্ব্বাদ করুন, এ ভুল যেন আমার কোনদিন না হয়।

মা হাসিয়া ফেলিলেন—ঠিক তো বাবা? তারপর খানিক থামিয়া আবার বলিলেন, কিন্তু মা বলে আমার কাছে কোনদিন একটা আবদারও ত' করলে না।

মায়ের চোখের কোলে তখন জল জমিয়া উঠিয়াছে।

হাসিয়া নীহার বলিল—সময় আসুক মা। তখন এতবড় আবদার জানাব যে আপনি দিশেহারা হয়ে যাবেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া মা বলিলেন—তাই জানিও বাবা।

* * * *

## নীহারের মা

গতরাত্রের সমস্ত রাগ হাল্‌কা মেঘের মত নীহারের মন হইতে উড়িয়া গিয়াছে। ডলি ও রেখাকে কাল পড়ান হয় নাই, সেজন্য সে প্রত্যুষেই তাহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়াই সে শুনিল মা, রেখা, ডলি ও অনিলবাবু আরো ভোরেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। সম্মুখে কল্পনাথকে দেখিতে পাইয়াই নীহার প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ কল্পনাথ ওঁরা এত ভোরে সব গেলেন কোথায়? কল্পনাথ বলিল—তাঁরা সব কি কিন্‌তে কাট্‌তে গেছেন, কালকেই সব দেওঘর যাচ্ছেন কি না।

ওঃ! তা তুমিও যাচ্ছ তো কল্পনাথ?

হ্যাঁ বাবু, আমাকে তো যেতেই হবে।

খানিকটা থামিয়া নীহার বলিল—এ-বাড়ীতে থাক্‌বেন কে? উত্তরে কল্পনাথ বলিল—বড় বাবু।

নীহার বলিল—কেন দীনু'কা তো আছেন—

মুখ বেঁকাইয়া কল্পনাথ বলিল—ওসব নামেই। কাজের বেলায় কাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-সংসারে কেউ ভাল না বাবু—

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নীহার বলিল,—তোমাকে বোঝাতে পারবো না কল্পনাথ, পৃথিবীতে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। তাসের ঘরের মত আমাদের জীবন, কাঁচের মত ক্ষণভঙ্গুর আমাদের মন; তাই এর ভাল মন্দ বিচার বড় সূক্ষ্ম, বড় কঠিন কল্পনাথ—

নীহার আরো বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সে থামিয়া যাইল। কাকেই বা সে শোনাইতেছে এসব—একথা কেই বা বুঝিবে!

কল্পনাথ হাঁ করিয়া এতক্ষণ নীহারের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। নীহার থামিলে সে ধীরে ধীরে বলিল—আমি ওসব কথা বুঝিনে বাবু—

নীহারের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।—

## নীহারের মা

অনিলবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নীহার সোজা তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া নীহারের বৌদি স্থনীতি দেবী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হ্যাঁ ঠাকুর পো এত সকাল সকাল ফিরলে আজ?

সংক্ষেপে নীহার বলিল—হ্যাঁ ভাই, শরীরটা আজ ভাল নেই কিনা—

নীহার নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। তাহার ঘরে আসবাব-পত্র বলিতে কিছুই নাই। একটা দড়ির খাটিয়া, তাহার উপর একটা ছেঁড়া লেপ ও একটা আধ-ময়লা চাদর। ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ বই খাতা ছড়ান। ঘরের মেঝেয় একরাশ ময়লা জমিয়াছে—কতদিন যে ঝাঁটা দেওয়া হয় নাই তাহার কিছু ঠিক নাই। ঘর এমন বিপর্য্যস্ত ও অগোছাল যে, দেখিলেই ঘরের ম্যালিক সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে হয় এত বড় ছন্নছাড়া ও উদাসীন মানুষ বুঝি ছুনিয়ায় ছুটি নাই। ঘরে ঢুকিয়াই নীহার খাটিয়ার উপর ধপাস করিয়া শুইয়া পড়িল। সামনের খোলা জানলা দিয়া প্রভাতের মিষ্টি রোদ আসিয়া ঘরখানাকে ভাসাইয়া দিতেছে। নীহারের দৃষ্টি উন্মুক্ত আকাশের পানে ছুটিয়া গেল। স্বচ্ছ নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘ তাহাতে খেলিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক পাখী তাহাদের অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাদের গতিবেগ অসামান্য। প্রাণধারার বিপুল চাঞ্চল্যে তাহারা উদভ্রান্ত। জীবনের সতেজতা তাহাদের স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিতে দেয় না—দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটাইয়া লইয়া যায়—যাযাবরের দল,—নীড় বাঁধিবার আস্তানা পায় না। জীবনের হাল্‌কা আনন্দে তাহারা ছন্নছাড়া, বাঁধনের গণ্ডীকে তাহারা শ্রদ্ধা করে না। আজকের এই প্রভাতকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। আজকের

## নীহারের মা

এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাত—সুনীল আকাশ, মুক্ত পাখীর দল—নীহারের মনে আগুন ধরাইয়া দিল। নীহার ভাবিবার চেষ্টা করিল—ইহাদের সহিত তাহার জীবনের সংযোগ কোথায়? ইহাদের সহিত ছন্দ রাখিয়া সে চলিতে পারিবে না, এত আনন্দ ধরিয়া রাখিবার মত মন তাহার নাই—সে শক্তিও সে কোনদিন অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে নাই। দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার জীবন আরম্ভ হইয়াছে, চোখের জলেই হয়ত তাহার শেষ! ঘরের ভাঙ্গা আসবাব পত্রও যেন তাহাকে উপহাস করিতেছে!—অসহ্য!!

নীহারের চোখের পাতা দুইটি ভিজিয়া উঠিল।

—ও ঠাকুর পো ঘরের দরজা দিয়ে কি করছ? দোর খোল।

নীহারের সমস্ত চিন্তা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলিয়া দিল।

কে বৌদি?

সুনীতি দেবী নীহারের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ ঠাকুর পো শরীর খারাপ হলে মানুষের চোখে জল আসে নাকি? তাঁহার স্বরে ব্যঙ্গ মেশান ছিল।

নীহার একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

কার জন্যে কাঁদছিলে শুনি?

নীহার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—কি যে বল বৌদি। তুমি দেখছি আমায় খালি কাঁদতেই দেখ।

সুনীতি দেবী হাসিয়া বলিলেন—তা আর দেখ্‌ব না। কাঁদবার বয়স যে পেরিয়ে গেল। এত করে বলছি যে আমার ডান্‌হাতের কাজ করবার একটি লোক এনে দাও, তা কি আর হবার যো আছে! মাঝে মাঝে মনে হয় কান পাকড়ে ধরে গলায় একটা পাথর বেঁধে দি।

## নীহারের মা

নীহার হাসিয়া ফেলিল—বেশ ত, ঘট্‌কী একটা লাগালেই পারো—

হ্যাঁ তা আর না। আমি লাগাই ঘটকী আর তারপর তুমি ব'লে বোস—না।

নীহারের একটু রাগ হইল। এই বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া দেওর ও বৌদিতে অনেকদিন অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। নীহার কতদিন স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে সে বিবাহ করিবে না। নিজের পেট চালাইতেই তাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়, ত' আর একজন! তাহার উপর বিবাহ জিনিষটাকে সে আদৌ পছন্দ করিত না। তাহার ধারণা বিবাহ করিলেই মানুষ একটি জন্তুবিশেষ হইয়া যায়, তাহার মন বলিয়া আর কোন জিনিষই থাকে না। স্বার্থে ও সংকীর্ণতার পাকে পাকে জড়াইয়া সে এমন হইয়া যায় যে বৃহত্তর মানব সমাজের সুখদুঃখের ইতিহাস তাহার মনে কোন দাগই আঁকিতে পারে না। নীহার হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তোমরা কি মনে কর বৌদি, বিয়ে করলেই মানুষ সুখী হয়?

ব্যঙ্গ করিয়া সুনীতি দেবী বলিলেন—একবার করেই দেখ না ঠাকুর!

উদাসীন স্বরে নীহার বলিল—তাই নাকি! তাহলে ভেবে দেখি—

একটু উষ্ণ হইয়া সুনীতি দেবী বলিলেন—তাই ভাবো বছরের পর বছর ধরে—

সুনীতি দেবী নীহারকে রাগাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু নীহারের কথায় নিজেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এমন সময় সুনীতির স্বামী বিনয়বাবু ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই তিনি সুরু করিলেন—রোজ রোজ ত' বাবা ছিঁড়ে ফেল্লে,—কি

যে করি ! সামনে মাকাল ফল পেকে রয়েছে অথচ তাকে পেড়ে নেবার মানুষ নেই। বলি যত ঝঞ্ঝাট কি ছাই আমার কাছে এসে পৌঁছুবে— বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

সুনীতি দেবী একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন—আঃ, তোমার আবার হোলো কি ? এক একজন করে রাস্তায় বেরুবে আর ঘরে ঢুকবে এক এক মূর্ত্তি নিয়ে। তুমি কি বলছ বল দেখি ? মাকাল ফল ! সে আবার কি ?

বিনয়বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাকাল ফলই বা কি এবং তাহা পাড়িবার মানুষই বা কে তাহা বুঝিতে নীহারের একমুহূর্ত্ত দেরী হইল না। পাছে আরো বেফাঁস কথা সব তাহাকে শুনিতে হয় সেজন্য সে তাড়াতাড়ি চটিজুতা জোড়া পায়ে গলাইতে গলাইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয়বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—দেখলে ছোঁড়ার কাণ্ড ! যেমনি কথা পেড়েছি অমনি ভাগ্‌ল। এমন ছেলে যদি কোথাও দেখেছি ! নেহাৎ মরবার সময় কাকাবাবু বলে গিয়েছিলেন তাই, নইলে আমার কি এতো মাথা ব্যথা পড়েছে বাবা···বাধা দিয়া সুনীতি দেবী বলিলেন—দেখ এক কাজ করো, ওর অজান্তেই একটা মেয়ে টেয়ে ঠিক করে ফেল। তারপর দেখা যাবে। বিয়ে না দিলে ও একেবারে গোল্লায় যাবে। দেখোনা দিনে রাতে খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন ভোলার মত, নাওয়া খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত নেই। পাগল না হয়ে গেলে বাঁচি।

বিরক্ত হইয়া বিনয়বাবু বলিলেন—যত সব ঝঞ্ঝাট—

পৃথিবীতে একজাতীয় লোক আছে, যাহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে ভালবাসে। আমাদের বিনয়বাবু ও সুনীতি দেবী

এই জাতীয় লোক। মৌখিক স্নেহে ও যত্নে নীহারকে তাঁহারা যতই আপনার করুন না কেন, অন্তরে অন্তরে তাঁহারা অন্য মতলব আঁটিতে-ছিলেন। নীহারের বিবাহ দেওয়ার মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে, তাহা তাঁহারা না ভাঙ্গিলেও নীহার কিছু কিছু বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই সে একেবারে বেঁকিয়া বসিয়াছে।

বিবাহ করিলে তাহার রোজগারের সব টাকাই প্রায় ইহাদের সংসারে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই জন্যই ইহাদের এত আগ্রহ।

কিছুক্ষণ পরে নীহার ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বিনয়বাবু বলিলেন—কি হে কোথা থেকে।

এই একটু ঘুরে এলুম।

বিনয়বাবু বলিলেন—তা চান খাওয়া সেরে একেবারে বেরুলেই পারতে। আর সারাদিন টো টো করে ঘুরেই বা কচ্ছ কি? চাকরী-বাকরী সে আর জুটবে ব'লে ত' মনে হয় না—

নীহার মনে মনে চটিতেছিল। সে ভাব মুখে প্রকাশ না করিয়া সে বলিল—জুটবে না বটে, কিন্তু ঘুরে দেখতে ত' আর দোষ নেই।

না, দোষ কিছু নেই। তবে এমনি করেই বা ক'দিন কাটবে। আর আমার অবস্থাও ত' ততো ভাল নয়—চাকুরে-জীবন—

বিনয়বাবু যেন চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলিতেছিলেন। সম্পর্কের বড় ভাই হইলেও নীহার বিনয়বাবুকে অশ্রদ্ধা করে নাই কোনদিন, সেজন্য তাঁহার সমস্ত কথা নীরবে সে হজম করিয়া গেল। একটি কথাও সে বলিল না—যেন মুখে চাবি আঁটিয়াছে।

মাঝে মাঝে নীহারের এ-সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে

কিন্তু কোথায়ই বা যাইবে। তাহার আপন ঘরও নাই আপন লোকও এমন কেহ নাই, যে তাহার নিকট অন্তরের সমস্ত কথা উজাড় করিয়া দিয়া মনটাকে একটু হাল্‌কা করিয়া নেয়। অনেক অনুযোগ, অনেক অভিযোগ তাহার অন্তরে এতদিন ধরিয়া জমা হইয়া আছে। অনেক কথা তাহার বলিবার আছে—সমাজের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে, এমন কি—ভগবানের বিরুদ্ধেও। কি দোষ সে করিয়াছে যে পৃথিবীতে সে একেবারেই নিঃসঙ্গ, একেবারেই একা! মাঝে মাঝে সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে নিজের অসামর্থ্যের কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। এতখানি ফাঁকা তাহার জীবন!

অল্পক্ষণ পরে নীহার খাইতে চলিয়া গেল। আহার শেষ করিয়া সে নিজের ঘরে যাইয়া কাগজ পেন্‌সিল লইয়া মাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিবার তাহার অনেক কিছু আছে, ভাষার আলোড়নে তাহার সমস্ত অন্তর গুমরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু বলিতে গিয়া কোথায় যেন বাধিয়া যাইতেছে। সে একখানি চিঠি লিখিল, বার বার সেখানিকে পড়িল, তারপর কি ভাবিয়া আবার তাহাকে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে আর একখানি লিখিল কিন্তু অকারণ উদ্গত অশ্রুতে চিঠি-খানি ভিজিয়া গেল। কাহাকেই বা সে জানাইবে তাহার গোপন বেদনার কথা, কেই বা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবে! যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরকে পুড়াইয়া কয়লা করিয়া দিতেছে, তাহা বুঝিবার বা অনুভব করিবার মত মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? হিংসা ও স্বার্থ লইয়া যে মানুষের কারবার, মন বলিয়া তাহার কি কোন পদার্থ আছে? পৃথিবীর প্রতি এক অপরিসীম ঔদাসীন্যে নীহারের মন দিন দিন ভরিয়া

উঠিতেছে, তবুও সমস্তই সে সহ্য করিয়াছে। মৃত্যু যদি হইত তা হইলে হয়তো সে বাঁচিয়া যাইত। নীহার মনে মনে হাসিল—অভাগা যেথায় যায় সাগর শুকায়ে যায়।—

এমন সময় কল্পনাথ আসিয়া বাহির হইতে নীহারকে ডাকিল। ব্যস্ত হইয়া নীহার উঠিয়া পড়িল।

—কি কল্পনাথ খবর কি ?

মা একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন বাবু—

নীহার চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল।

মা লিখিয়াছেন—

স্নেহের পুত্র নীহার, আমি উপরি উপরি দু'খানি পত্র তোমাকে দিলাম কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। তুমি বোধ হয় মায়ের ওপর রাগ করেছ। তোমাকে আমার বড় আপনার বলে মনে হয়, সেজন্য তোমার সুখদুঃখের খবর না পেলে আমি বড় উতলা হয়ে উঠি, মন আমার বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাবা, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে, একদিন সময় মত বলব।

হ্যাঁ আর একটা কথা। আমরা দেওঘরে যাচ্ছি। আমার মাথার দিব্য রইল। তোমার যাওয়া চাই-ই!

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—মা

চিঠি পড়া শেষ হইলে নীহার কল্পনাথকে বলিল—কল্পনাথ, মাকে বোলো আমি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করব। কল্পনাথ চলিয়া গেল। নীহার কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। অস্থির হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, কে যেন তাঁহাকে টানিতেছে, যাহা উপেক্ষা করা অসম্ভব!

সমস্ত দিনটি নীহারের যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। খেয়ালই নাই তাহার কখন যে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ধীর পদক্ষেপে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ যখন খেয়াল হইল তখন সে টের পাইল কেমন একটা জ্বালা সরীসৃপের আকার ধারণ করিয়া যেন সমস্ত দেহে চরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত অন্তরটি যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে, কোথাও আলোকের জন্য এতটুকু প্রবেশ পথ নাই। চারিদিকে গভীর অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার! তাহার অন্তরের সেই আঁধারে বাহিরের গাছ পালা, বাড়ীঘর সবকিছু ভরিয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত যেন অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কিন্তু সে উপায়হীন, হাত পা যেন বাঁধা, প্রতিকার করা এখন আর কোন প্রকারেই যায় না।

একটু পরেই সে উঠিয়া পড়িল। সামনের দোকান হইতে এক কাপ চা খাইয়া ছাত্রীভবনের দিকে চলিতে সুরু করিল। সেখানে গিয়া সামনেই যে পড়িল, সে রেখা। রেখা নীহারকে সাদরে ভিতরের পড়িবার ঘরে লইয়া গেল। নীহার দেখিল সম্মুখেই মা। মা এতক্ষণ এইখানেই বসিয়া একটি গেঞ্জী বুনিতেছিলেন। নীহারকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই তিনি প্রথমে একটু কিন্তু হইয়া পড়িলেন, তারপর সে ভাব কাটাইয়া কাছে আসিয়া কহিলেন—তোমাকে আজ এত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন নীহার?

নীহার একটিবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল।

এত মধুর কথা জীবনে সে কমই শুনিয়াছে। পাছে মায়ের চোখে সে ধরা পড়িয়া যায় তাই চোখ নত রাখিয়াই কহিল—কই মা? মা যেন বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন—না কি? আজ বুঝি খাওয়া দাওয়াও হয়নি? আর হবেই বা কোত্থেকে, দেখবার শোনবার কেই বা আছে। সেই জন্যেইত' এত করে বলি, এখানে না থাকো, না থাক্‌বে, দু'বেলা দু'মুঠো সময় মত খেয়ে যেতেও কি পার না? তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন—সংসারে যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত! তোমার দরদ বোঝ্‌বার মত কেই বা আছে? যাক্—আগে কিছু আনিয়ে দি, খেয়ে নাও, তারপর যা খুশি কোরো। বলিয়াই তিনি কল্লনাথকে খাবার আনিতে দিলেন।

বাধা দিয়া নীহার কহিল—খাবার আনাবার কোন দরকার নেই মা, আমার খিদে নেই!

মা তাহার কথার উত্তরে একটু হাসিয়া কহিলেন—জানি, ছেলের কখন খিদে পায় না পায়। মাকে তা বলে দিতে হয় না।

কল্লনাথ খাবার আনিয়াছিল, তিনি নীহারকে সামনে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

নীহার আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ব্যথিত হইয়া মা কহিলেন—কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?—

নীহারের দুই চোখ যেন কিসের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে সে কহিল—এই জল কান্নার নয় মা, আনন্দের! তারপর একটু হাসিয়া কহিল—তাই বসে বসে ভাবছিলাম যেন কী মন্ত্রে এই এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত জীবনের ধারা পাল্‌টে গেল। আমি স্নেহের

## নীহারের মা

কাঙ্গাল মা, কেউ কোনদিন এতটুকু ভালকথা বলেনি, কেউ কোনদিন এত স্নেহ করে খেতে বলেনি। খাওয়ার মধ্যে যে এত মাধুর্য্য থাকৃতে পারে, তা আমি কখনও জানৃতাম না।

লজ্জিত হইয়া মা বলিলেন—কী-ই বা এমন খেলে নীহার, যার জন্যে তোমার এত বলার থাকৃতে পারে?

নীহার মুগ্ধ কণ্ঠে কহিল—যা দিয়েছেন, তার বেশী কেউ কোনদিন দেয় নি, তার বেশী কেউ এমন ভাবে প্রাণের সবকিছু উজাড় করে পথের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে দিতে পারে না মা! এত ভালবাসা, এত যত্ন, এ যে আমার কল্পনারও অতীত!

মা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—কাল ত' সব চল্লুম দেওঘর—তা তুমি কী করবে, যাবে তো?

নীহার নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল—না, আমি আর কি করতেই বা যাব? অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ ত'!

বাধা দিয়া মা কহিলেন—তোমায় ত' তার হিসেব করতে বলছিনে বাবা, তোমাকে শুধু যেতে বলেছি আমি। যাবে ত'—?

নীহার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। ডলি ও রেখা দু'জনেই আব্দারের সুরে বলিল—আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে মাষ্টার মশাই। আমরা আপনাকে ছাড়বোনা কিন্তু?

নীহার অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব।

মা বলিলেন—চেষ্টা নয়, যাওয়া চাই-ই! আর এই নাও, এই কুড়িটা টাকা তোমার গায়ের জামা-টামা যা দরকার সব কিনে কেটে ঠিক হয়ে থাকৃবে।—

নীহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল—টাকা কড়ির দরকার নেই মা।

টাকা কড়ি যা দরকার, তা আমার কাছে যা আছে তাতেই হয়ে যাবে।

মা কোন কথায় কান না দিয়া নীহারের পকেটে জোর করিয়া টাকা কয়টি পুরিয়া দিলেন।

এমন সময় অনিলবাবুর ছোট বোন রেণুকা ঘরে প্রবেশ করিল। এই কয়দিন হইল সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। ইহারা দেওঘর যাইতেছে; সেই হিসাবে বড় বৌ ঠিক ভাবে সবদিকে নজর রাখিতে পারিবে কিনা তাহা দেখিতেই সে আসিয়াছে। ছোট বৌকে এ ঘরে আসিতে দেখিয়াই তাহার বুকে কিসের একটা জ্বালা ধরিয়াছিল। মাষ্টার বাহিরের মানুষ, তাহার সহিত এত কথা কিসের!—তবে ভদ্রতার খাতিরে সেখানে কিছু না বলিয়া হাসিমুখেই সে বলিল—তুমি এখানে বৌদি? আর আমি তোমাকে সারাবাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি?

ধরিত্রী দেবী কহিলেন—কেন ভাই হঠাৎ কি দরকার পড়ে গেলো? রেণুকা বিরক্তিভরে কহিল—দরকার না থাকলে কেউ কি আর কাউকে খোঁজে বৌদি? বলিয়াই ঠোঁট উল্টাইয়া সে চলিয়া গেল।

বাহিরের দিক হইতে সামাজিক ভদ্রতায় বিশেষ কোন অসৌজন্য প্রকাশ পায় নাই। তবুও সন্ধ্যার অন্ধকার যেন হঠাৎ ঘোরাল হইয়া উঠিল। ধরিত্রী দেবী মনের মধ্যে কেমন একটা তীব্র অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মার চিঠির উত্তর নীহারের আর দেওয়া হইল না। সে এই রহস্যের কোন সমাধান করিতে পারিল না। ডলি ও রেখা দু'জনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। নীহারের সমস্ত মন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। মা চলিয়া গেলে নীহার কাগজ কলম লইয়া মাকে চিঠি লিখিতে বসিল:—

# নীহারের মা

পূজনীয়া,—

মা, আজ দুপুরে আপনার আর একখানি চিঠি পেলাম। কিন্তু চিঠির মানে ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হ'ল যেন, মা হ'লে যে জ্বালা সহ্য করতে হয়, পথের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের জন্যে তা আপনি অকাতরে সহ্য কচ্ছেন। আপনার এ ছেলেটি নেহাৎ বোকা নয় মা, কিছু কিছু বুঝতে পারে। জগতকে সেও এটুকু বয়েসে যেভাবে চিনেছে তার দাম নিতান্ত কম নয়। কিন্তু মা, উপায় নেই আমার নইলে দেখিয়ে দিতাম তাদের, যারা এই সব মিথ্যা অভিযোগের বোঝা আপনার মাথায় চাপিয়েছে।

কিন্তু এটুকু জেনে রাখুন মা, আমি আপনার স্নেহের অমর্য্যাদা করিনি। আপনার যে রূপ আমার সমস্ত বুক জুড়ে বসে আছে, তাকে প্রকাশ করা যায় না, তা নাহলে দেখাতাম যে অকৃতজ্ঞ আমি নই। সেরূপ যখনই ধ্যান করি, বাহ্য জগতের আমি সবকিছুই ভুলে যাই, তন্ময় হয়ে যাই এই রূপের ধ্যানে!

এটুকু ভালই বুঝেছি বারংবার আঘাত পেয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যে, এ পৃথিবীতে কেউ কারুর নয়। সম্বন্ধ যতই থাক না পরস্পরের মধ্যে, কর্ত্তব্যজ্ঞান কারুর প্রতি কারুর নেই—ছেলের প্রতি বাপের নয়, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নয়, ভায়ের প্রতি বোনের নয়—সব ঘুরে বেড়াচ্ছে —নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে। শুধু প্রতি পলে সভ্যজাতির বুকে অসভ্যতার পাষাণ-ভার চেপে বস্‌ছে। এরা কেউ মানুষ নয় মা! তাই সভ্যতার শিখরে উঠে ভুলে গেছে কর্ত্তব্য, সভ্যতা, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, ভক্তি সব কিছু। সেদিনকার মিলন, সেদিনকার ত্যাগ, শান্ত সুখের সংসার,

সেদিনের বিশ্বাস, সব কিছু লোপ করে দিয়েছে এরা। তাই আজ সংসার অশান্তির বিষে বিষিয়ে উঠেছে। তাই আজ অবিশ্বাসের দোলায় পাকে পাকে ঘুরে মরছে মানুষ। এরা আসল চেনেনা, নকল নিয়ে টানাটানি করে, অন্তর চেনে না তাই ওপরটাকে জয় করেই উল্লাসে মেতে ওঠে। কিছুতেই বিশ্বাস নেই এদের, জোর করে তবুও বিশ্বাসকে পুরে রাখে এরা।

মা! মন না শুদ্ধ হলে কখনও বিশ্বাস বলুন, ধর্ম্ম বলুন, ভগবান বলুন কিছুই পাওয়া যায় না। আপনি সংসারে থেকেও নিজেকে যতখানি ত্যাগ করতে পারবেন, ততখানি মনের শান্তি ফিরে পাবেন আপনি। নিজেকে ভুলে থাকতে পারলে তবে সব কিছু পাবেন আপনি। আজ মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারের সীমা নেই, পশুর মত ব্যবহার করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনা কেউ। যারা সংসারকে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছে, জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে, তাদের মানুষ সম্মান দেখাতে পারল্ না। তাদের ওপর অবিচারের, অত্যাচারের সীমা নেই। কিন্তু মা এ কদিন সইবে। একদিন এর বিচার হবেই, এই যে পশুত্বের মনোভাব নিয়ে মানুষ পশুর সমাজ ছেড়ে মানুষের সমাজে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—যে স্ত্রী নিজের সবটুকু উজাড় করে স্বামীর কাছে বিলিয়ে দিল; সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে স্বামীর সমভাগিনী হয়ে যারা নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেললে—তাদেরই অপমান, লাঞ্ছনার সীমা নেই। এর কি কোন দিনই বিচার হবে না ভেবেছেন।

এরা জানেনা যে স্ত্রী-জাতির কী রূপ! এরা জানে শুধু স্ত্রীকে নিয়ে উপভোগ, সম্ভোগ আর বিলাস! স্ত্রী কখনও মায়ের মত, কখনও সেবিকার

মত, কখনও স্ত্রীর মত! তাই আমাদের দেশ সতী সাধ্বী, পুণ্যবতী মায়ের দেশ। তাই এখানে এত স্নেহ, সন্তানের প্রতি এত দরদ। তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক!

কী লিখ্‌বো মা আপনাকে? লেখার মত আছেই বা কি? তবুও যতই দেখি, ততই মনে হয় চলে যাই দূরে অন্য কোথাও, যেখানে সমাজ নেই, শাসনের বাঁধন নেই, হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, সংশয় নেই, এ পৃথিবী অর্থের দাস! মানুষ সব কিছুর বিনিময়ে, নিজের মনুষ্যত্ব নিজের আত্মমর্য্যাদা সব কিছু বিকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু স্বার্থের পেছনে পেছনে। স্বার্থ ছাড়া এ যুগের মানুষ এক কণা চলে না। এরা না মানে শাসন, না শোনে হিতবাণী! গভীর পঙ্কিলতায় এদের শেকড় পচিয়ে দেয়, এদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে। মা, নিজের মনকে যে অশুদ্ধ রেখে, অন্তঃসার শূন্য করে ঘুরে বেড়ায়, সে কী পায়? কিছুই না। তারাই বেশীর ভাগ সময় পাপের চরম সীমায় পৌছে নরকের দরজা খুলে দেয়। তারাই শেষে পৃথিবীর এই দুঃখের আবর্ত্তে পড়ে হাঁকপাঁক করে মরে। পাপ—সে তো নিজের মনের মধ্যেই পোষা আছে, পুণ্য সেও ত' এই মনেরই রাজ সিংহাসনে! কিন্তু মা, মানুষের মন এমনই দুর্ব্বল যে একটি ইঙ্গিতেই পাপের ছোবলে রাজসিংহাসন বিষিয়ে ওঠে, মানুষের মনুষ্যত্ব তাইতে আত্মহত্যা করে।

দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল আর বুকফাটা কান্না মানুষ কতদিন ধরে পুষে রাখতে পারে মা? আপনার চিঠির ছত্রে ছত্রে সেই বেদনার চাপা কান্নার আওয়াজ আমি শুনেছি। কিন্তু তা নিয়ে আপনার অধৈর্য্য হবার কিছু নেই মা। সংসারে আত্মগ্লানির মধ্যে যেটুকু বেদনা ছাই চাপা আগুনের মত জ্বলে, সেই টুকুই মানুষকে অধীর কোরে তোলে; কিন্তু

এই সয়েই থাকৃতে হবে, দুঃখকে দুঃখের বোঝায় চাপালেই সেইখানে আসবে নির্ম্মল, সত্যসুন্দর, পরমার্থিয় সুখ, যা মানুষকে সেই পথে নিয়ে যাবে যেখানে বিরাজ করছে শান্তির মহা-স্নিগ্ধতা।

তখনই মানুষ বুঝবে যে, সংসারে বাস করে সংসারী সাজ্‌তে হয় কিন্তু তাতে যেন কোন আসক্তি না জন্মায়, চতুর্দ্দিকে ভোগের উপকরণ ছড়ান থাকৃলেও কেমন করে তার মধ্যে বাস করে তাকে এড়িয়ে চল্‌তে হয়, সংসারকে খুব ভাল বাস্‌তে হয়, তবুও তার মধ্যে এটুকু ভাব সব সময়েই জেগে থাকে যে এ-সব মিথ্যে, সব মায়া!

এরা ভুলে গেছে মা কেমন সম্পদ! ভিখিরী যেমন ধনের প্রয়োজন বোঝে ও তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, আমি আজ তেমনি পিতৃমাতৃহীন হয়ে তাঁদের কথা একান্তভাবে অনুভব করছি। মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিক্ষণে বুঝ্‌ছি বাপ মায়ের অবর্ত্তমানে কত দুঃখ। আকাশ, বাতাস, প্রতি অণুপরমাণুতে যেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের ছায়া, ভালবাসা ভেসে বেড়াচ্ছে, আমায় স্পর্শ করছে, আমাকে রক্ষা করছে।

আর নয় মা, চিঠি এবার শেষ করি। অনেক কথাই লিখেছি, যা অন্যায়, তা' অবোধ ভেবে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার কৃপাতেই পৃথিবীতে আমি সুখের আস্বাদন পেয়েছি, এ স্নেহ হারালে আমার বেঁচে থাকা দায় হবে। আপনার নিবিড় স্নেহের বিপুল ভাণ্ডারের কণামাত্রও আমার জন্যে রাখ্‌লে ধন্য হ'ব আমি। আমায় ভুলবেন না মা। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জান্‌বেন।

প্রণতঃ—নীহার

নীহার একনিশ্বাসে চিঠি লিখিতেছিল, লিখিবার সময় অন্য কোনদিকে খেয়াল ছিল না তাহার। যখন খেয়াল হইল তখন দশটা বাজিয়া

গিয়াছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি মুড়িয়া ডলিকে দিয়া বলিল—ডল্, চিঠিখানা সাবধানে মাকে দিয়ে এসত' ?

ডলি চিঠি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। নীহার রেখাকে ভূগোলের পড়া মুখস্থ করাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ডলি ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে সে মাকে চিঠি দিয়া আসিয়াছে। উৎসুক কণ্ঠে নীহার বলিল—মা কিছু বল্লেন নাকি ?

ডলি বলিল—না, নিয়েই আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। নীহার আর কথা না কহিয়া পড়াইতে লাগিল।

ছাত্রীদের ছুটি দিয়া নীহার বাড়ী যাইবে এমন সময় অনিলবাবু বাড়ী আসিলেন। নীহারকে কহিলেন এই যে,—যাক ভালই হ'ল। হ্যাঁ, কাল বরাবর এইখানেই আসবে, একসঙ্গে station-এ যাওয়া যাবে। আর দেখ, এক কাজ কোরো আমি সকালেই বেরিয়ে যাব, তুমি ডলি, রেখা এদের নিয়ে একেবারে stationএই যেও। মালপত্রগুলো আগে থেকেই লাগেজ করে দেব'খন, কেমন ?

নীহার উত্তরে বলিল সেই ভাল। ওসব কাজ যত শীগ্‌গির শেষ হয় ততই ভাল। তাহলে আর বিশেষ হাঙ্গাম পোয়াতে হবেনা।

অনিলবাবু নীহারের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন—তাহলে—তোমার জিনিষপত্রগুলো বেঁধে ছেঁদে ঠিক করে নাওগে, এদিকে ত' সব ঠিকই আছে!—

নীহার সম্মতি জানাইয়া কহিল—এই যাই। ছাত্রীদের ছুটি দিয়া নীহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে অমল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক সমস্ত পৃথিবীর বুকে স্বপ্নের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহরের এত আলোর মাঝেও তাহার কত মাধুর্য্য! অনিলবাবুর বাড়ীর সামনে দুইধারে

# নীহারের মা

কেতকী, হেনা, রজনীগন্ধার ঝাড়। মত্ত বাতাসে গন্ধ যেন পাগলের মত ছুটোছুটি করিতেছে। লতানে গাছগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া একে অপরকে জড়াইয়া গেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নীহারের, রাত্রির এই রমণীয় দৃশ্য অত্যন্ত ভাল লাগিল। তাহার মনের সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার এক অপরূপ সামঞ্জস্য, সুদূর নীল আকাশ ভরিয়া যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা, উহা যেন তাহারই বুকের অনুভূতি রূপ ধারণ করিয়াছে। এতদিন পরে সে মাকে একান্তে পাইবে, অত্যন্ত আপনার করিয়া, ছেলে যেমন করিয়া পায়। এ সৌভাগ্যের সীমা নাই তাহার। ভাবিতে ভাবিতে নীহার অস্থির হইয়া উঠিল, কতক্ষণে মাকে নিজের জীবনের কাহিনীটুকু সে ব্যক্ত করিবে।

## ৪

ঘরে বাহিরে পৃথিবীর সকল স্থানে, নীহারের মনে সর্বত্র কিসের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিয়তির দুর্বার আঘাত প্রতিপদে সহ্য করিয়াও সে সংসারের এই সমস্ত গ্লানি, পঙ্কিলতাকে সরাইয়া চলিতেছিল। কিন্তু নিয়তি যেখানে প্রতিবাদী, সেখানে পুরুষকার পদে পদে বিপন্ন, একা পুরুষকারের দোহাই দিয়া মানুষ কতখানি ভাগ্যের যশ অর্জ্জন করিতে পারে। ভাগ্য যাহার মন্দ হয়, সে কিছুতেই সুখের মুখ দেখিতে পায় না। অদৃষ্টের লেখা মুছিবার নয়, যাহা আছে তাহা হবেই। মানুষ নিয়তির অধীন!

ভোরের আকাশে শুক তারাটির মত এই যে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ছেলেটি তাহার জীবনের গোপনস্মৃতির ইতিবৃত্তের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে, অশ্রুবেদনার দুঃসহ দুঃখের গান গাহিয়া পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহার জন্য কে দায়ী!

নীহার যাহা যাহা দরকার, সব সুটকেশে ভরিতেছিল, এমন সময় বৌদি আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। তারপর নারীসুলভ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সারাদিন কোথায় ছিলে, ঠাকুর পো?

নীহার চকিতে একবার সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়াই আবার নিজের কাজে মন দিল। সুনীতি একটু চিন্তান্বিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি গো, আমার কথা যে কানেই যাচ্ছে না! সারাদিন বাড়ী এলে না, বলি ব্যাপার কী? যদিই বা এলে তারপর, এসেই বাক্স, পেঁট্‌রা গোছাচ্ছ—

নীহার নীচু হইয়াই শুধু জবাব দিল—হুঁ।

সুনীতি কহিল—মানে। আমাদের ওপর রাগ করে কোথায় যাচ্ছ শুনি?

নীহার সংক্ষেপে বলিল—কোথায় আর যাব ভাই, এ সংসারে যাদের কেউ কোথাও আপনার বল্‌তে নেই, তারা কোথায় যায়?

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিল—গাছ তলায়।

নীহার জবাব দিল—ঠিক বলেছ, পৃথিবীর অভাগাদের জন্যে ভগবান ঐটুকু জায়গাই রেখেছেন। আবার শুধু তাই নয়, আহারের ব্যবস্থাও করেছেন।

ব্যঙ্গ করিয়া সুনীতি প্রশ্ন করিল—কী রকম!

নীহার জবাব দিল—কেন? ভিক্ষাবৃত্তি, স্বাধীন ব্যবসা! কারো গলগ্রহ হ'তে হবেনা। কারো মনে কষ্ট দিতে হবেনা। কেমন মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন! নীহার একটুখানি চুপ করিয়া আবার বলিল—জগতে যাদের ওপর মানুষ নির্ভর করে চলে, শুধু তাদের জন্যেই ওই প্রশস্ত রাজপথ, ওই ধূসর মরুভূমি, ওই শ্যামল মাঠ ঘাট সব খোলা থাকে। তারাই শুধু কিছুতেই মানুষকে অপমান করে না, পরিত্যাগ করে না। তারা মানুষ নয় কি না!

সুনীতি সামান্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তার মানে?

—তার মানে? তার মানে যারা নিজের আত্মীয়ের বুকে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়া পুড়িয়ে দিতে পারে তার ভেতরটা, তাদের ওপর কতটা বিশ্বাস করা চলে, তুমিই বল না? সে নির্ভরতার দাম কতটুকু? যাক্—এ সব কথা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে। আমি একেবারে কোথাও যাচ্ছি না, উপস্থিত কাল ওদের সঙ্গে দেওঘর যাব।

## নীহারের মা

সুনীতি মনে কেমন একটা অসহিষ্ণুতা লইয়া চলিয়া গেল। নীহার সব গোছাইয়া যখন শুইয়া পড়িল, রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তখনই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। কেমন এক অপূর্ব্বভাব সমস্ত অন্তরটুকু ভরিয়া রহিয়াছে। কোনরূপে রাত্রিটা কাটিয়া যাইতে যা দেরী। তারপর সকালে তাড়াতাড়ি করিয়া স্নান সারিয়া লইবে। তার তো কোন কাজের কথাই নাই। ছাত্রীবাড়ীতেই কাল খাইয়া লইবে 'খন। তারপর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভাবিতে লাগিল,—এতদিন পরে সুখের সংসার, এতদিন পরে মাকে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া দুই হাতে কৃপণের মত লুণ্ঠন করিবে সে মাতৃস্নেহ!

ভোরে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটি মুটে ডাকিয়া তাহার মাথায় সুট্‌কেশ বিছানা চাপাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

দশটা বিশ মিনিটে গাড়ী। বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেরী হইয়া যাওয়াতে নীহার তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

শীতের বেলা হু হু শব্দে কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে নয়টা বাজিয়া গেল। রাস্তা, বাজার, দোকান লোকের ভীড়ে মুখর হইয়া উঠিল। নীহার ব্যস্ত হইয়া আরও দ্রুত পা চালাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূলি উড়িতেছে, দূরের দিকে যতদূর চোখ যায়, কিছু চোখে পড়ে না। তার ওপর নীহারের মনের অবস্থাও ভাল ছিলনা। নানান কথা আসিয়া মনে ভীড় করিয়াছে, নীহার তাই লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে রাস্তা পার হইতেছে, এমন সময় পিছনদিক হইতে কিসের ধাক্কায় সে ছিট্‌কাইয়া পড়িল পথের একধানে। দেওঘরের স্বপ্ন নিমেষের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। চোখের সম্মুখের রাশি রাশি অন্ধকার বিপুল

সমারোহে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল ; নীহারের আর কিছুই স্মরণ রহিল না।

নীহারের যখন জ্ঞান হইল, তখন পাশ ফিরিয়া শুইতেই সর্ব্বাঙ্গে সে ভীষণ ব্যথা বোধ করিতে লাগিল। জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ আসে নাই।—তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই সে ডাকিল মা—

কোথা হইতে এক তরুণী ছুটিয়া আসিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে ঔষধের শিশি লইয়া একদাগ ওষুধ ঢালিয়া নীহারের ঠোঁটের কাছে ধরিয়া কহিল—এটুকু খেয়ে নিন্ত' ? নীহারের জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই সে ওষুধ না খাইয়া প্রশ্ন করিল—আমার মা কোথায় ?

তরুণী তাহার কথায় কান দিল না। বলিল আগে ওষুধটুকু খেয়ে নিন্। তারপর আপনার সব কথার জবাব দেব আমি।

শান্তশিষ্ট শিশুর মত নীহার ওষুধ খাইয়া লইল। তারপর প্রশ্ন করিল আচ্ছা ; আমি কোথায় বল্‌তে পারেন ?

তরুণীটি কোন কথার উত্তর না দিয়া নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

নীহার অবাক হইয়া গেল। একি হইল তাহার, কোথায় আসিয়াছে সে। যে তাহার কাছে ছিল এতক্ষণ সে ত' ডলি বা রেখা নয় ! তবে, এ সে আসিল কোথায় ? হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, আজ তাহার মায়ের সহিত দেওঘর যাইবার কথা আছে। স্মরণ হইতেই মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল সে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, মাথা তাহার অত্যন্ত ভারী ; তুলিবার মত শক্তি তাহার নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল পথেই ত সে বাহির হইয়াছিল যাইবার জন্য। তবে—

## নীহারের মা

ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল হঠাৎ কিসের ধাক্কায় সে যেন পড়িয়া গিয়াছিল। বোধ হয় কোন গাড়ীর, বোধ হয় ইহাদেরই গাড়ীর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হইবে, তাই ইহারা যত্ন করিয়া হয়ত' তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। আরও ভাবিয়া সে ব্যথা অনুভব করিল যে হয়ত' মায়ের কানে এতক্ষণে এ খবর গিয়া পৌঁছিয়াছে। মা হয়ত' তাহার জন্য বসিয়া নিরালায় কাঁদিতেছেন।

বাহিরের দিকে তাহার চোখ পড়িতেই হাসি আসিল তাহার। অত্যন্ত করুণ, ব্যথাভরা সে হাসি। কান্নারই সে রূপান্তর! সেখানে ত' যাইবার কথা ছিল সকাল দশটায়। এখন ত' সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। নিশ্চয়ই তাহারা নীহারের জন্য অপেক্ষা করেন নাই। কী হইল তাহারও সংবাদ পান নাই। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। হায়রে মানুষ, হায়রে তাহার অদৃষ্ট!

ওদিকে নয়টা বাজিয়া যাইবার পরও নীহারের দেখা না পাইয়া ধরিত্রীময়ী অস্থির হইয়া উঠিলেন। ডলি, রেখার খাওয়া দাওয়া, কাপড় জামা পরা সব সারা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজেরও প্রায় সব হইয়া গিয়াছে। এখন নীহার আসিলেই হয়। ধরিত্রীময়ী উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে বারেবারে দুয়ারের দিকে ব্যাকুল হইয়া চাহিতে লাগিলেন।

নীহারের লেখা চিঠিখানিও পড়িবার সময় হয় নাই। কী লিখিয়াছে কে জানে? মায়ের প্রাণ অকারণেই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিজেকে যেন তিনি কিছুতেই প্রবোধ দিয়া মনকে স্থির রাখিতে পারিতে ছিলেন না। মুখে তিনি কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু তাঁর বুকের ভিতরকার জ্বালাটা যেন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল। তিনি যেন অনুভব

করিতে লাগিলেন। আশেপাশে সর্ব্বত্রই যেন অমঙ্গলের ছায়া ভ্রুকুটি করিতেছে। কোন কাজে আর তিনি মন দিতে পারিতেছিলেন না। সর্ব্বদাই যেন চোখ ভরিয়া আপনা হইতেই জল ভরিয়া আসিতেছিল।

কল্পনাথকে তিনি পাঠাইয়াছিলেন। তাহার যত দেরী হইতে লাগিল ততই যেন তাহার মনে একটা আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা জুড়িয়া বসিতে লাগিল। এক একবার নিজেকেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কেন? কিসের জন্যে এত মাথা ব্যথা তাঁহার? তাঁহার মেয়েদের মাষ্টার ছাড়া নীহারের সঙ্গে আর কি সম্পর্ক থাকিতে পারে। এই ভাবে যতই মনকে তিনি প্রবোধ দিয়া নীহারের চিন্তা দূরে সরাইতে চেষ্টা করিলেন, ততই যেন তাহার জন্য বুকভরা মায়া কোথা হইতে আসিয়া অন্তরখানি জুড়িয়া বসে!

ইতিমধ্যে কল্পনাথ আসিয়া খবর দিল যে মাষ্টারবাবু দেওঘর যাইবার জন্যই স্যুটকেশ লইয়া অনেক আগেই বাহির হইয়াছেন। মার মুখে কোন কথা সরিল না। নিঃসন্দেহে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পথে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। নীহারের কথা স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া উঠিল। কোন রূপেই তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। কল্পনাথের সম্মুখেই টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। যে পথের ছেলেকে পথের বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি এখন যেন তাহা ছাড়া অন্য কিছু স্মরণই করিতে পারেন না।

হায়রে মায়ের স্নেহ! বিচার নাই, ভেদাভেদ নাই, পর আপনার জ্ঞান নাই—মায়ের চোখে সন্তান শুধু সন্তান।

ইতিমধ্যে অনিলবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। নীহারের station-এ যাইতে দেরী দেখিয়া তিনি নিজেই চলিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই

ধরিত্রীময়ীকে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—ব্যাপার কী বলোত' তোমাদের ? নীহার কোথায় ? এদিকে যে ট্রেনের সময় হয়ে এল !

ধরিত্রীময়ী শুধু বলিতে পারিলেন কী জানি ! রুদ্ধ আবেগে আর কোন কথাই তাহার মুখে আসিল না।

অনিলবাবু আর কোন কথা না বলিয়াই সকলকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ডলি রেখা আগেই উঠিয়া বসিয়াছিল, মা ছায়াকে কোলে লইয়া পিছু পিছু গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

হঠাৎ ডলি বলিল—আলমারীর চাবিটা দাও ত মা একবার,—একটা জিনিষ ফেলে এসেছি ! দাও, দাও তাড়াতাড়ি বলিয়া চাবী লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ও আলমারী খুলিয়া চিঠিখানি লইয়া আসিয়া বলিল চুপি চুপি,—চিঠিখানার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলে মা ? ভাগ্যিস্—!

## ৫

রাত্রে জ্বরের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। নীহার নানা রকম ভুল বকিতে স্বরু করিল। তরুণী যখন আহার শেষ করিয়া নীহারের কাছে আসিয়া বসিল, নীহার তখন জ্ঞান হারাইয়াছে। মাথায় জলপটি দিয়া সে জোরে জোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই জ্বর নামিয়া গেল। নীহার শান্তভাবে ঘুমাইতে লাগিল।—তরুণী নীহারের মুখের দিকে তাকাইল। কিসের এক অজ্ঞাত ভাবনায় যেন ছেলেটির মুখে ছায়া পড়িয়াছে। বেশ স্বন্দর চেহারা ত'! দেখিলে বড় লোকের ছেলে বলিয়াই বোধ হয়!—ইস্, শেষে তাহারই গাড়ীতে চাপা পড়িল। নীহার যদি শেষে না বাঁচে। মেয়েটির অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে সে স্থির করিল, গাড়ী চড়া সে ছাড়িয়া দিবে।

একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। আঘাত বিশেষ কিছু হয় নাই। ধীরে ধীরে নীহারও সারিয়া উঠিতে লাগিল।—তরুণীটি যথাসাধ্য নীহারকে খুশী করিবার চেষ্টা করে। নীহার এখন একটু একটু চলিতে পারে, শরীরে সামান্য বলও হইয়াছে, কিন্তু মনে যেন তাহার এতটুকু শক্তি নাই। সে শুধু ভাবে, কোথায় সে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি ঘটিয়া গেল। ইহজীবনে এমনটা যে ঘটিতে পারে ইহা সে ভাবিয়াও দেখে নাই। এতখানি বয়সের মধ্যে মাত্র এই দুটি স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে আসিয়া ইহা যেন সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। একজন ঐ ধরিত্রী দেবী, যাঁহার স্নেহ ও প্রেম মানুষের মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না,

হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়। অপর জন সম্পূর্ণ অপরিচিত এই তরুণী—যার নিঃস্বার্থ সেবায় যত্নে আজ সে বেঁচে উঠেছে।

মায়ের সংবাদ সে অনেকদিন রাখে না। কেমন আছেন তাহারা? হয়ত' দেওঘর হইতে ফিরিয়া তাহার কত খোঁজ করিয়াছেন। মায়ের কথা ভাবিয়া মন তাহার অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কবে যে এখান হইতে ছাড়া পাইবে, তাহারও ঠিক নাই।

আরও ভাবিয়া ব্যথিত হইল সে, যে, তাহার মত পাপী বোধ হয় আর কেহ নাই। সাধনার পথে আগাইয়া যে পথভ্রষ্ট হয় তাহার দুর্গতি অশেষ, তাহার মত হতভাগ্য জগতে নাই। দীর্ঘদিনের চোখের জলে সে যে মহাদেবীর পায়ে মালা রচনা করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছে, তাহার কী কোনই মূল্য থাকিবে না, একটা অজানা, অচেনা মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এত শীঘ্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এ চিন্তায় নীহার যেন পাগল হইয়া উঠিল—না, না, এমন সে কখনই হইতে দিবেনা। সেই যে তাহার ইষ্ট, সেই মূর্ত্তির পূজাই যে নীহারের ধর্ম্ম, তাহাই যে নীহারের নিকট সত্য ও সুন্দর!

মায়ের কথা ভাবিতে নীহারের দুই চোখ জলে আপনা হইতেই কখন ভরিয়া উঠিল, এতদিনের সঞ্চিত চোখের জল আজ যেন হঠাৎ বাঁধ উপ্‌ছাইয়া উঠিয়াছে। বিছানায় মুখ লুকাইয়া সে শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, স্নেহ করিবার কেহ নাই। এ তাহার কোন পাপের শাস্তি!

অনেক পরে ব্যথার ভাবটা যেন কমিয়া আসিল। তখন সে মেয়েটির কথা ভাবিতে লাগিল। কতটা নিঃস্বার্থ অন্তর দিয়া তাহাকে সে আপন করিয়া লইয়াছে! তাহার পরিবর্ত্তে এমন কী-ই বা সে পাইল তাহার কাছ হইতে। এই মেয়েটির কার্য্য কলাপ, আচার সত্য সত্যই তাহাকে

মুগ্ধ করিয়াছে। সে আরও ভাবিল কোন সূত্রে সে আসিয়াছে এখানে, একটা এ্যাকসিডেণ্ট বইত' নয়। তাহা না হয় ইহার গাড়ীতেই হইয়াছে। তাই বলিয়া কে কবে এমন করিয়া একজন অনাত্মীয়কে আপনার করিয়া লয়, এমন ভাবে স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করে। হাসপাতাল তখনো ছিল। আজ এই মেয়েটির হাসি, মিষ্টি কথা, সব কিছুই তাহার কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। ভাবিয়া নীহার অবাক হইল, তাহার জীবনে একি বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল!

মেয়েটির নাম জ্যোৎস্না, সত্যই জ্যোৎস্নার মত শুভ্র ও পবিত্র সে। যৌবনের প্রথম স্পর্শে, দখিনের বসন্ত মলয়ের স্পর্শে সমস্ত শরীর খানি যেন কিসের কামনায় থর থর করিয়া লতিকার মত কাঁপিতেছে সর্ব্বক্ষণ। কেমন সুন্দর নম্রতা! যেমন রূপ তেমন গুণ পাইয়াছে। উভয়ের সমন্বয়ে জ্যোৎস্না অপূর্ব্ব। এতবড় বিশাল সৌধের মাঝে আপনার বলিতে মাত্র দুইটি প্রাণী—মা ও মেয়ে। মা থাকেন দেশের বাড়ীতে, কেননা বিশাল জমিদারীর কাজকর্ম্ম ও সকল দিক তাঁহাকেই দেখিতে হয়। একজন খুব পুরাতন নায়েবের হাতে কলিকাতার বাড়ী ও জ্যোৎস্নার ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি বড় একটা কলিকাতায় আসেন না, দেশেই থাকেন। তা ছাড়া, বিধবা মানুষ বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরে একটা আচার সংস্কার লইয়া থাকাটা যতটা মনের শুদ্ধতা ও আত্মতৃপ্তির ভাব আনিয়া দেয়, এমনটি কিছুতেই নহে।

নীহার যতই এই মেয়েটির কথা ভাবিতে থাকে ততই একটা অযাচিত স্নেহ আসিয়া বারে বারে তাহার হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিয়া উন্মুক্ত করিয়া যায় যেন। নীহার ভাবে, তাহার আবার একী হইল? এমন ত' সে চাহে না। তাহার যে এখন অনেক কাজই বাকী পড়িয়া আছে!

## নীহারের মা

হঠাৎ ভাবিতে ভাবিতে মায়ের করুণ মুখ খানি মনে পড়িল তাহার। সেই কাতর মলিন মুখ। মা নীহারকে আহ্বান করিতেছেন—এসো নীহার। কই তুমি ত এলে না? আমার ডাক উপেক্ষা করলে তুমি, তুমি আমার তেমন ছেলে নও। আমি যে তোমারই পথ চেয়ে বসেছিলাম, তুমি এসে নিয়ে যাবে বলে। কই তোমার দেখা ত পেলাম না বাবা। ভাবিয়া নীহারের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল; আকুল হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, কবে এখান হইতে মুক্তি পাইবে! ব্যথিত উদাস মুখখানির উপর একটা কিসের ছায়া ভাসিয়া উঠিল। একে রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি দুর্ব্বলতায় দীপ্তিহীন হইয়াছিল, তাহার উপর চিন্তায় চিন্তায় সে যেন অস্থিচর্ম্মসার হইতে বসিয়াছে। বিরাট ও দীপ্ত ভাস্করের মতই তাহার চরিত্রের সংযম ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। তাহার পক্ষে এ বাঁধন যেন একটা অতৃপ্তি ও যন্ত্রণার নাগপাশ! ইহা হইতে ছাড়া পাইলেই খুশী হইবে সে।

শেষ শীতের আকাশ খানিতে সূর্য্যের শেষ আলোটুকু মুছিয়া যাইবার আগে তাহার ব্যথাভরা মুখখানির উপর ছায়াপাত করিয়া গেল। শুধু স্মৃতির রেখা জাগিয়া রহিল আবার তাহার উদয়ের অপেক্ষা জানাইয়া। উদার আকাশ, সব স্থির ধীর, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নাড়িতেছেনা। সামনের বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। বাগানের মালীরা নিজেদের কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। নীহার চুপ করিয়া জানালায় বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল—জগতের সব কাজই শেষ হইতে চলিয়াছে, কেবল আমারই আরব্ধ কাজ শেষ হইল না।

এইরূপেই জানালায় বসিয়া নীহার রোজ বিকাল বেলাটি কাটাইয়া দেয়। জ্যোৎস্না নিজে অনেকদিন তাহাকে বাগানের মধ্যে লইয়া

যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে যায় নাই। জ্যোৎস্নার বুঝিতে বাকী নাই যে, তাহারই অজ্ঞাতে কখন নীহারের উপর অনুরাগ তাহার হৃদয় মন জুড়িয়া বসিয়াছে। তাই সে যতই নিজেকে নীহারের কাছ হইতে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে, ততই যেন সে কি একটা আকর্ষণে জড়াইয়া পড়ে—যেন কি একটা তাহার বুকের মধ্যে এমনভাবে বাসা বাঁধিয়াছে, যাহাকে তাড়াইবার কোনই উপায় নাই। কেবল যেন তাহার জন্যই নীহারের নিকট বার বার ছুটিয়া আসিতে হয়। অনেকদিক দিয়াই নীহারের সহিত সে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছে। সবদিক দিয়াই বুঝিয়াছে যে নীহারের মত এত স্নেহ, এত মুক্ত হৃদয় জগতে অতি অল্প লোকেরই আছে।

সেদিন বিকালের আগে তাহার মনটি হঠাৎ বিষণ্ণ হইয়া গেল। কি মনে করিয়া বাগানে যাইয়া মালীদের কাছ হইতে এক গোছা ফুল লইয়া ধীরে ধীরে সে নীহারের ঘরে প্রবেশ করিল। নীহার তখনও বাহিরের জানালায় চোখ রাখিয়া বসিয়াই আছে। জ্যোৎস্না স্থির হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। কোন এক অজানিত রহস্যের পাকে পড়িয়া এই মানুষটিকে সত্যই তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। অন্তরের সুগভীর প্রেম যেন আপনা হইতেই এই মানুষটির পায়ে আপনাকে সমর্পণ করিতে উৎসুক। নীহার যেন তাহাকে কেমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার জীবনের বিরাট ফাঁক যেন তাহার অজান্তেই ভরিয়া তুলিয়াছে। এমন করিয়া নীহার যে তাহাকে পাইয়া বসিতে পারে, তাহা সে ভাবিতেই পারিল না। জ্যোৎস্না স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীহার জানালায় চোখ রাখিয়া ভাবিতেছিল—নারীর পাওয়া ও

পুরুষের নিকট হইতে পাওয়া যে কত তফাৎ তাহা জ্যোৎস্না মোটেই ধারণা করিতে পারে নাই। তাই তাহার অন্তরকে সে একেবারে খুলিয়া দিয়াছে তাহার সম্মুখে। প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না যে তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। এভাব তাহার কাছে গোপন নাই। আর কেমন করিয়াই বা পারিবে সে বুঝিতে। ধনীর মেয়ে, অগাধ ঐশ্বর্য্যের ঝলক ও বিলাসের মাঝে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিকতার বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে না গিয়াও সে বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এতটুকু তাহার মর্য্যাদা হানি ঘটিতে দেয় নাই।

নীহারের উপর জ্যোৎস্নার একটু দাবীই রহিয়াছে। তাহাকে সে এতদিন ধরিয়া সেবাযত্ন করিল, তাহার আহার নিদ্রা ছাড়িয়া এই যে আত্মনিয়োগ ইহার কি কোনই মূল্য নাই, কৃতজ্ঞতা বোধও দেখাইবে না সে। নীহারের এই মেয়েটির জন্য দুঃখ হইল। বাস্তবিকই নীহারের জন্য সে কী করিতেছে? তাহাকে পাওয়ার জন্য যেন সে দিবারাত্রি ওই একই চিন্তায় ভোর হইয়া থাকে। সব কথাই বলে, হাসে, গল্প করে, কিন্তু তাহার মাঝে যে সূক্ষ্ম বেদনার সুর বাজিতে থাকে তাহা নীহারের কান এড়ায় নাই। জ্যোৎস্নাকে ডাকিবার জন্য সে উঠিতে যাইবে এমন সময় চোখে পড়িল জ্যোৎস্না দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নীহার অবাক হইয়া বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অথচ আমাকে ডাকেন নি?

জ্যোৎস্নার চোখ দু'টি আপনা হইতেই মাটির দিকে নিবদ্ধ হইয়া গেল—অস্ফুটস্বরে কি উচ্চারণ করিল, নীহারের কানে যাইল না। নীহার ডাকিয়া কহিল দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

জ্যোৎস্না কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিল।

## নীহারের মা

অনুরাগের আকর্ষণে আজ তাহার হৃদয়ে তুমুল ঢেউ উঠিয়াছে, আজ সে তাহার একটা মীমাংসা করিয়া যাইবে। জীবনে এই তাহার ধ্রুবতারা, ইহাকেই সে লক্ষ্য করিয়া চলিবে। আর অন্য কাহাকেও সে সাথী করিতে পারিবে না। সেই তাহার ইষ্ট, সেই তাহার কাম্য। ইহার জন্য সে সমস্ত কষ্ট, সব দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়া যাইবে। কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবে না, অভিযোগ আনিবে না। সে নীহারকে ভালবাসিয়াছে সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া এ তাহার মোহ নয়। ইহাকে সে ব্যর্থ হইতে দিবে না। জীবনের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যদি তাহাকে পাইতে হয়, তাহাও সে স্বীকার করিয়া লইবে।

আর নীহার ভাবিতেছে, কেমন করিয়া সে এই ঐশ্বর্য্যের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবে। এখন শারীরিক বেশ সুস্থই আছে সে। আর বেশীদিন এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি তাহার? জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার চোখ দু'টি কিসের এক গভীর বেদনায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ নীহার ডাকিয়া তাহার তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিল।

জ্যোৎস্না চোখ খুলিয়া ডাকিল—নীহারবাবু!

—বলুন।

জ্যোৎস্না বলিল—এ জগতে কেউ যদি কিছু চায়, সে কি পায় তা ?

একথার অর্থ নীহারের কাছে অদ্ভুত ঠেকিল—তাই সে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—কি বলছেন আপনি ?

জ্যোৎস্না অধীর হইয়া বলিল—আমার কথার উত্তর দিন।

ধীর কণ্ঠে নীহার বলিল—পায়, যদি তার সেই চাওয়ার মধ্যে একাগ্রতা থাকে, নিষ্ঠা থাকে।

## নীহারের মা

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নীহারের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কই আমার চাওয়ার কোন মূল্য ত' আমি আজও পেলাম না।

নীহার বলিল—নিশ্চয়ই পাবেন। যদি সত্যই আপনার সে চাওয়ার মধ্যে সাধনা থাকে, আপনি নিশ্চয়ই পাবেন সেই ইষ্টকে।

—পাব? সত্যি বলছেন—পাব?

জোর দিয়া নীহার বলিল—নিশ্চয়ই এর মধ্যে আর কোনও সন্দেহ আছে?

জ্যোৎস্না নীহারের মুখের দিকে তাকাইল। ভাবিল—আমার স্বামী তুমি, এত সুন্দর আমি কোন পুরুষকেই দেখিনি! কত পুরুষই ত' চোখে পড়িল, কিন্তু এত সুন্দর ত' কাহাকেও দেখিনি। তুমি আমার সেই পরম সুন্দর। তোমারই ধ্যানে আমি আমার ইহজীবন কাটাইয়া দিব।

মনের অস্থিরভাব একটু কমিলে সে আবার বলিল—একটা কথা শুনবেন নীহারবাবু—।

—বলুন। বলিয়াই নীহার বুঝিল কি কথা জ্যোৎস্না বলিতে চাহে। তাই সে আবার বলিল—কিন্তু তার আগে একটা কথা।—প্রতিজ্ঞা করুন যে যা আমি বল্‌বো, তা যদি আপনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিকও হয়, আপনার ধন-ঐশ্বর্য্য, মান সম্ভ্রম জগতের সমস্ত প্রয়োজনীয়তার বদলেও আপনি তা করতে পেছুবেন না। শুনে এতটুকু বিচলিত হবেন না।

জ্যোৎস্না কোমল কণ্ঠে উত্তর দিল—আমার জীবন দিতেও যদি বলেন, তাতেও আমি পেছব না। তুচ্ছ স্বার্থ দিয়ে এই জগতের—বিলাসকে আমি তৃণের মত হেয় মনে করি। বলুন কি করতে হবে? আপনার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি।

—আমার জন্যে !—নীহার আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জ্যোৎস্নার কাছ হইতে এমন সহজ স্বীকৃতি সে আশা করে নাই।

—হ্যাঁ, শুধু আপনার জন্যে জগতের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্যকে আমি পায়ে ঠেলে আপনার কাছে সরে আসতে পারি।

নীহার বলিল—কেন আপনি আমার জন্যে মাত্র এ-দুদিনের আলাপে আপনার জীবনকে নষ্ট করবেন। আমি কে? আর আমায় কতটুকুই বা জেনেছেন আপনি?

জ্যোৎস্না অধীর হইয়া বলিল—না না, আপনার বাইরের পরিচয় চাইনে আমি। জানবার যতটুকু—তা আমি সবই জেনেছি। তাই আজ—ওগো—! সে আর কোন রূপেই নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া সে মুখ ঢাকিল। অবাক হইয়া গেল নীহার। জ্যোৎস্না তাহাকে ভালবাসে ইহা সে অনেক আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এমন ভাবে তাহার নিজের অজ্ঞাতে সে যে একটি মেয়ের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে, কেউ যে তাহাকে এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই সে কহিল—আজ আপনি কেন আমার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন, কেন আজ আপনার এত অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আপনি আমায় সব খুলে বলুন?

নীরব সন্ধ্যার নিরালায় আজ একি নবলীলা প্রকাশ পাইল! পরস্পরের মাঝে একজন চায়, অপরের উপর তাহার সকল ভার দিয়া শান্তি পাইবার জন্য; আর একজন অস্বীকার করে এই নির্ভরতার দাবী বহন করিতে। একজন চায় তাহার প্রাণের অনন্ত বাসনার সাক্ষী রাখিয়া

একজনকে বাধিতে ; আর একজন চায় সমস্ত বাঁধন ফেলিয়া মুক্তির জন্য পাগল হইয়া ছুটিতে। একজন চায়, তাহার কুমারী জীবনের সব সাধ আকাঙ্ক্ষার ডালি নিবেদন করিয়া সব কিছুর শেষ করিয়া দিতে—আর একজন সেই প্রেমরত্নকে নেহাৎ উপহাস মনে করিয়া নিষ্ঠুরের মত দুই পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে চায়!

জ্যোৎস্না আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। উপুড় হইয়া নীহারের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। বিপর্যাস্ত কালো মেঘের মত ঘনকৃষ্ণ চুলে নীহারের দুই পা ঢাকিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না পায়ে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিল—বলুন আপনি আমার কথা রাখ্‌বেন, আমার কথা পায়ে ঠেলবেন না? আমার সব দাবী, সব চাওয়া আজ মঞ্জুর করে দেবেন? বলুন—

নীহার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এত বড় সমস্যার সমাধান করিতে আজ পর্য্যন্ত তাহার কোথাও ডাক পড়ে নাই। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল—সব শুন্‌বো আপনার, আপনি আগে পা ছেড়ে উঠুন। চাকররা কেউ এসে পড়লে কী ভাব্‌বে বলুন দেখি?

জ্যোৎস্না বলিল—ছাই ভাব্‌বে, আমি কি কারো অপেক্ষা করি নাকি ভাবার? কেউ কিছু ভাব্‌বে না, আপনি আগে জবাব দিন আমার কথার। বলিয়া সে মাথা কুটিতে লাগিল নীহারের পায়। নীহার তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল—ছিঃ, ছেলেমানুষী করবেন না। বসুন দেখি স্থির হয়ে। তারপর বলুন কী আপনার দাবী। সব শুনে জবাব দেব আমি।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল জ্যোৎস্না। নিজেকে সে যেন সংযত করিবার কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না। উচ্ছ্বসিত

আবেগে তাই সে কহিয়া উঠিল—আমি আপনাকে ভালবাসি নীহার-বাবু!

নীহারের কানে ছোট্ট কথাটি মৃদুভাবে আঘাত করিল—আমি আপনাকে ভালবাসি নীহার বাবু। নাঃ, নীহার ভুল শোনে নাই,—জ্যোৎস্না যে তাহাকে ভালবাসে ইহাতে সংশয় নাই। নীহারের হাসি আসিল। তাহার আবার এ কী পরীক্ষা! আজীবন সন্ন্যাসী সে, মাতৃসাধনার দ্বারে তার এ তুচ্ছ রক্ত মাংসের শরীর বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। জীবনের এতগুলো দিন সে যে আরাধনায় কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছে, এক সঙ্গে আজ তাহা একমুহূর্ত্তেই নষ্ট হইয়া যাইবে? নিজেকে সংযত করিয়া সে কহিল—আজ আমার কী আছে, যা দেখে জ্যোৎস্না আমায় ভাল বেসেছ, মুগ্ধ হয়েছ! আজ আমার দেবার মত কিছুই ত' নেই। আজীবন দুঃখ আর বেদনার জ্বালাকে বুকে পুরে রেখে ধূমকেতুর মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আমার বেদনার কথা, দুঃখের কথা কেউত শুন্‌বে না বা শোনেও নি! যার কাছে গেছি সেই আমাকে ঘৃণা করেছে, সেই আমাকে সরিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আমার, নিয়তির বিধানে আমি দিগ্‌ভ্রষ্ট মহাজ্যোতিষ্কের মত সকলের জীবনের আকাশে শুধু জ্বালাই সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছি!

জ্যোৎস্নার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া সে ধীর গলায় বলিল—তা হোক, তবু আমি তোমাকেই চাই।

নীহার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ভুল বুঝোনা জ্যোৎস্না, এক মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে নিজেকে নষ্ট হ'তে দিওনা। আমাকে চাওয়া মানে তোমার নিজেকে হত্যা করা। আজীবন সন্ন্যাসী আমি—অনেক আগেই মায়ের পায়ে আমার আমিত্বকে বিক্রী করে ফেলেছি। সেই

মহাসাধনাই আমার পরম লক্ষ্য, সেই সাধনাতেই আমি নিজেকে বলি দিতে চেয়েছি। যতদিন না আমি সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি, ততদিন কিছুই করবার উপায় ত' নেই আমার! আমাকে এখন তুমি ছুটি দাও, মুক্তি দাও! বেদনাহত হইয়া জ্যোৎস্না বলিল—তোমাকে আমি ছুটি দেব, মুক্তি দেব? একথা কেমন করে বল্‌ছ তুমি? আজ আমারও যে এই দেহটা তোমারই পায়ে বিসর্জ্জন দিয়েছি। তোমার কাছ থেকে সরে গেলে কেমন করে বাঁচব আমি? পারব না, পারব না আমি,—দুই হাতে সে আর্ত্তের মত নিজের মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে অস্ফুট স্বরে, বিকৃত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিল—সে আমি কিছুতেই পারব না!

আবিষ্টের মত নীহার শুধু বলিল—পারবে না?

জ্যোৎস্না আর সম্বরণ করিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া নীহারের কোলে মুখ গুজিয়া—পারব না, পারব না আমি, কিছুতেই পারব না। ও আদেশ কোরোনা আমাকে। আমি সত্যি সইতে পারব না।

ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিল সে, দুই চোখের শ্রাবণের ধারা আজিকার উচ্ছ্বাসে বাধা মানে নাই, দুই কূল ছাপাইয়া সুন্দর গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিতেছে। দুই চোখ তাহার প্রেমাশ্রুতে সুন্দর, অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, মুখে তাহার অপূর্ব্ব দীপ্তি। সে কহিল—তোমাকে ভাল বেসেছি, এই আমার অপরাধ? কিন্তু, ওগো, কেন, কেন তুমি গ্রহণ কচ্ছ না আমায়? ভালবাসায় ত' পাপ নেই, যেভাবে তোমাকে চেয়েছি তাতে ত' সংশয় নেই! তুমি যে আমার স্বামী! আকুল হইয়া সে কহিতে লাগিল—স্ত্রী যেভাবে স্বামীকে ভালবাসে আমিও সেইভাবে চেয়েছি তোমাকে!

## নীহারের মা

তুমি যদি আজ সরে যাও, আমি কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? একজনকে সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে আর কার কাছে যেতে পারি আমি? তুমি আমাকে দ্বিচারিণী হ'তে বল? আমার ইহকাল, পরকাল সব নষ্ট করে দিতে চাও?

কালের নগ্নমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া নীহার চম্‌কাইয়া উঠিল। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার কাণের কাছে বিকৃত কণ্ঠে বলিতেছে, পাপ—পাপ করছ তুমি কেন? তোমার ও ধর্ম্ম-পত্নী। ওকে তুমি গ্রহণ করবে না কেন? ওকে গ্রহণ করলে তোমার মাতৃসাধনায় কিসের বিঘ্ন? কাপুরুষ তুমি, ভীতু, দুর্ব্বল—হাঃ হাঃ হাঃ! সমস্ত পৃথিবী তাহার চোখের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল—সত্যই ত, সে কি পাপের আশ্রয় লইতেছে?

জ্যোৎস্না তখনও বলিতেছে—ভালবাসার প্রতিদান পাবনা আমি? আমার চাওয়াটা কি সব মিথ্যে, সব মোহ? আমার আগ্রহ, প্রাণের বেদনা, বুকের তৃষ্ণা মেটাতে যে তোমার কাছে ছুটে এলাম তাকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে তুমি, এত নিষ্ঠুর তুমি হ'তে পারবে! আমার সমস্ত আশা, সব স্বপ্ন, সব ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে যাবে?

বাহিরে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। নিবিড় মেঘ ঈশানের কোণে পুঞ্জীভূত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণার সূচনা প্রকাশ করিতেছে। বাগানের বড় বড় গাছগুলিতে ঝড়ের দোলা লাগিয়া হঠাৎ যেন অভ্যস্ত জীবনধারায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে সুরু হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে যেন একটা আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত!

নীহার ধীরে ধীরে বলিল—জ্যোৎস্না, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট, তোমার যত্নে আমি সত্যিই মুগ্ধ, কিন্তু তোমার মনে যে এমনধারা একটা সুর বাসা বেঁধেছে, তা আমি একদিনের জন্যেও জানতে পারিনি।

যাক্, যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে থাকো, তবে তার প্রতিদান পাবেই। আজ আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, একদিন আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। কিন্তু, কিন্তু সে আজ নয়। ততদিন যদি তুমি ঠিক সন্ন্যাসিনীর মত অপেক্ষা করতে পার, তবেই। আমার সাধনা সিদ্ধ হ'বার আগে তোমাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব জ্যোৎস্না।

অধীর কণ্ঠে জ্যোৎস্না বলিয়া উঠিল—ও-সব যুক্তি তর্কের বোঝা নামিয়ে ফেলে আমার প্রতি তোমার কি এতটুকুও কৃপা দেখাতে পার না? শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার কি এতটুকুও মায়া বোধ হয় না? এতটুকু দয়া কর—তাতে যে আমি সব ফিরে পাব, এটুকুও পার না তুমি?

নীহার স্থির হইয়া ঘাড় নাড়িল—পারি না জ্যোৎস্না, সে অধিকার নেই আমার।

বাহিরে যত আকাশ বিদ্যুৎভরা মেঘ লইয়া দুই হাতে ধ্বংসের বাজনা বাজাইতেছে, সেই তালে তালে সমগ্র পৃথিবী দুলিতেছে যেন, আজ বুঝি তাহার আর রক্ষা নাই, সব কিছু ভাসিয়া গেল।

নিরুপায় জ্যোৎস্নার চোখ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া। কিছুই রহিল না তাহার, এত চেষ্টা করিয়াও সে বাঁচাইতে পারিল না নিজেকে, বাহিরের ওই নিঃস্ব পৃথিবীর মতই তাহার সব কিছু ভাসিয়া গিয়াছে আজ, নিজের নিঃস্বতাকে উপলব্ধি করিয়া দুই চক্ষু তাহার কিছুতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। আকুল হইয়া সে নীহারের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল—আমি কি করব বলে দিয়ে যাও!

শান্তভাবে নীহার জবাব দিল—আজ আর আদেশের বাঁধাবাঁধি নেই। তোমার মনের ধর্ম্মই কর্ত্তব্যের ঈপ্সিত পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে, যা করে মনে শান্তি পাবে সেই কাজই কোরো। মনে রেখো আমার কোন বাধা নিষেধই থাকবে না তাতে। নীহার উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ চলি জ্যোৎস্না, কেমন? তোমার এ দয়ার ঋণ একদিন শোধ করব আমি। ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল সেটুকু।

অজস্র জলেরপ্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না বাষ্পময় চক্ষু দুটি তুলিয়া একান্ত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজকের রাতটুকুও কি থাকবে না তুমি? এ জল ঠেলে কি ক'রে কোথায় যাবে?

কিছুতেই সে যেন আর সংযত করিতে পারিতেছে না নিজেকে।

নীহার শুধু বলিল—এমন অভিসারের রাতে বাধা দিতে নেই জ্যোৎস্না? তুমি ত' আমাকে বেঁধে ফেলেছ, আর ত' তোমাকে বাদ দিয়ে চল্‌তে পারব না আমি!

কোনরকমে জ্যোৎস্না কহিল—তাই যাও আর বাধা দেব না তোমাকে। উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারিল না, সবলে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া নীহারের সম্মুখেই ছোট্ট বালিকার মত জ্যোৎস্না কাঁদিয়া উঠিল।

সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল নীহার। বাহিরের অসহ্য বারিপাতের সোঁ সোঁ শব্দ কাহার বুকের যেন আর্ত্তনাদের মত শুনাইতেছে। জ্যোৎস্নার কান্নার সহিত তফাৎ নাই উহার। নীহার গায়ে চাদরটা মুড়ি দিয়া, দুই হাতে কান ঢাকিয়া পথে নামিয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

# নীহারের মা

ইহার পর হইতেই জ্যোৎস্না কুমারী থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী সাজিল। এখন আর সে জ্যোৎস্না নাই। সংসারে থাকিয়াও সে সব হাসিমুখে ত্যাগ করিয়াছে, অর্থের ভাণ্ডার ভিখারী অতিথিদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। নিজে সে কোন ব্যাপারে আর বিশেষ হস্তক্ষেপ করিত না। অন্য সকলের দ্বারাই করাইত, এবং সকলের পিছনে থাকিত সে। যাত্রীপূর্ণ নৌকার চালক যেমন সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া নৌকা চালনা করে, যাত্রী-দিগকে প্রচুর আনন্দ ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে পৌছাইয়া দিয়া সকলের পিছনেই পড়িয়া থাকে, জ্যোৎস্নাও তেমনই সকলের পিছনে রহিল, নিজের সব কিছু বিলাইয়া দিয়া—সকলের মঙ্গল, শুভ চিন্তার মধ্যদিয়া সকলকে আগাইয়া দিয়া।

## ৬

ষ্টেশনে গিয়া মোটর দাঁড়াইল। ধরিত্রীময়ী চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। অন্তরে বাহিরে শুধু নীহারের সেই করুণ মুখখানিই চোখে ভাসিতেছে! প্রাণের কথা কাহাকেই বা খুলিয়া বলেন। স্বামীকে বলিতে যাইলে, পাছে তিনি বিরক্ত হন, সেই ভয়ে তাঁহাকেও সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সব আনন্দ যেন চন্দ্রগ্রহণের গভীর কালিমাময় চাঁদের মতই আঁধারে ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাঁহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না, দেহে যেন প্রাণ নাই, চোখে সে দীপ্তি নাই, মুখে সে হাসি নাই, সবকিছুই কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে। কত আনন্দের সহিত স্বামী পুত্রের সহিত বিদেশ ভ্রমণে যাইতেছিলেন, কত আশা লইয়া। পথের মাঝে এ কি বিপ্লব ঘটিয়া গেল!

অনিলবাবু পূর্ব্বেই টিকিট কিনিয়া বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি সকলকে লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন ও নানা গল্পগুজবের মধ্য দিয়া সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহার সহিত তিনি কথা কহিতেছিলেন তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে গিয়া খোঁজ করিলে দেখিতে পাইতেন, পুত্রস্নেহের অসীম বেদনা সেখানে কিরূপভাবে অনুভূত হইতেছে!

ঢং—ঢং—ঢং, গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। সবুজ নিশানা দুলাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতদূর দৃষ্টি যায় মা ষ্টেশনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন কোন কারণে হয়ত নীহারের দেরী হইয়া গিয়াছে। এখনই ছুটিয়া আসিবে।

# নীহারের মা

বাঁক ফিরিয়া গাড়ী ষ্টেশনকে পিছনে ফেলিয়া ছুটিতে লাগিল।

তবুও মুখে হাসি রাখিয়া সকলের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হইল, গল্প করিতে হইল। নিজে তিনি সন্তানের জননী হইয়া সন্তানের মায়া আজ তীব্ররূপেই অনুভব করিতেছেন। দুঃখ তাঁহার এই যে কেহ তাহার জন্য একটু খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত লইল না। সকলের জন্যই সে প্রাণ দিয়া করিয়া যায়, অথচ কেহই তাহার জন্য এতটুকু অনুভব পর্য্যন্ত করে না। হায়রে পৃথিবী এমনই স্বার্থপর! আকুল হইয়া তাই বাহিরের পানে চোখ রাখিয়া তাঁহার চোখের জলের ভাষা বারে বারে সেই নিঃস্বার্থ পরমপুরুষের পায়ে এই নিবেদনটুকুই জানাইতে লাগিল—যার কেউ নেই, তুমি তাকে দেখো ঠাকুর, তোমার হাতেই তাকে রেখে চল্লুম। তুমিত জান, তার জন্যে কতটা উতলা হয়ে তাকে ফেলে চলেছি। তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিলেন না। পাছে কেহ তাঁহার চোখের জল লক্ষ্য করে সেই ভয়ে বাহিরের পানেই চক্ষু রাখিয়া উদাস ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

শীতের সুশীতল বাতাস বেশ জোরে আসিয়া সকলের গায়ে লাগিতেছিল। ডলি ও রেখা মায়ের নিকট হইতে সুটকেশের চাবি লইয়া গরম জামা গায়ে দিল। মা ছায়াকে লইয়া গাড়ীর এক ধারে বসিয়া দূরের পানে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কেমন নীলাকাশের গায়ে চিল্লগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে—উর্দ্ধে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু নীল আর নীল। নীচে পাকা ধানগাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া কেহ বা উন্নত-শীর্ষ হইয়া রহিয়াছে নববধূর মত সলজ্জভাবে মাথা নত করিয়া রহিয়াছে। কোথাও সাদা সাদা বকগুলি খালে বসিয়া আহার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কোথায় কৃষক-কন্যার দল জোট-বাঁধিয়া ট্রেন চলা দেখিতে দেখিতে

কেহ গাঁদা ফুলের পাঁপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া মাথায় গুজিতেছে—নাচিতেছে, খেলিতেছে। মাঠ, প্রান্তর সব যেন কেমন শোভায় আনন্দিত, মুখরিত!

অসীম নীল আকাশের দিকে চাহিয়া মায়ের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমনি নীলার গায়ে যখন গভীর শব্দে মেঘগুলি আসিয়া জড় হইয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলে, তখন এই নীলার বুকে কতখানি বেদনার আঘাত বোধ হয়, মার মত তাহা আজ কেহই বুঝিল না।

স্নেহ, মায়া, যেখানে একবার ঘর পাতিয়া বসে, সেখান হইতে তাহাকে দূর করিবার জন্য যতই আঘাত করা যাউক না কেন, কিছুতেই সে টলে না, বরং আঘাতের পর আঘাত সহিয়া তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়। মায়ের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিল। পরের ছেলের উপর এই যে অকৃত্রিম ভালবাসা, ঘন ও প্রগাঢ় যাহা একদিনের স্নেহের আতিশয্যে দান করিয়াছেন তাহা যেন আর সরান যায় না!

ডলি ও রেখা মায়ের নিকট সরিয়া আসিল। মা ও মেয়েতে অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর রেখা বলিল—আজ যদি মাষ্টার মশাই থাকতেন, মা, কেমন হ'ত বলোত?

ডলি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সত্যি কত আনন্দই না হ'ত মা!

মা সাড়া দিলেন না। যেমন বসিয়াছিলেন সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন—নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত।

ডলি সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ভেবে কী করবে মা? মাষ্টার মশাই নিশ্চয়ই আস্‌বেন। হয়ত কোন বিশেষ কারণে আটকে গেছেন, তাই আস্‌তে পারেন নি।

রেখা বাধা দিয়া বলিল—মাষ্টার মশাই ত' কথা দিয়ে তার খেলাপ করে না কখনও ? এই তার প্রথম হ'ল।

ডলি বলিল—নারে, বোধ হয় কোন অসুখ বিসুখ করেছে তাই আসা সম্ভব হয়নি। নইলে তিনি এমন নয়! দেখেছিস্ ত'—নিজের সব কিছু অগ্রাহ্য করে আমাদের জন্যে কত কি করেন তিনি। রেখা চুপ করিয়া রহিল।

ডলি রেখার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। ডলির বয়স চৌদ্দ, কিন্তু রেখাকেই দেখিলে বরং মনে হয় ডলির চেয়ে বড় হইবে। রেখার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ডলির চেয়ে বেশী; কিন্তু তাহার আচার আচরণ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। লেখা পড়ায় সে ডলির চেয়ে ভাল কিন্তু মাঝে মাঝে বড় চঞ্চল হইয়া ওঠে। ডলি অপরদিকে ধীর, স্থির, নম্র। এই গুণটির জন্যই সে সব সময় সকলের কাছে আদর ও সুখ্যাতি পায়।

ডলি নীহারকে ভক্তি করে, মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসে। এ শ্রদ্ধা তাহার ছোট বোনের মত। করুণা ও ব্যথায় এই মেয়েটির চোখে অশ্রু টল্ মল্ করিতেছিল। সে ভাবিত, নীহার বাবু যদি সত্যই তাহাদের পরিবারের কেহ হইত, কিম্বা যদি সত্যই তাহার মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া জন্মাইত, আজ তাহার তাহা হইলে সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না, একজন ভায়ের মত ভাই পাইয়া সে সত্যই তৃপ্ত হইত। কত সুখীই হইত সে, তাহা বলিয়া শেষ হয় না। তাই বারে বারে তাহার শিশু প্রাণটি ঐ আত্মভোলা লোকটির জন্য কেমন বিমনা হইয়া যায়। তাই সে যাহাতে মায়ের কাছে চিরদিন আপন ছেলের মত হইয়া থাকিতে পারে তাহারই চেষ্টা করে। কখনও কখনও একান্তভাবে প্রার্থনা করে—ভগবান, আজ যিনি আমার মাষ্টার মশায় হ'য়ে এসেছেন, দুদিন বাদে ওঁকে যেন মায়ের

ছেলে, আমার ভাই বলে জান্‌তে পারি। আমার এই সাধটুকু পুরিয়ে দিও ঠাকুর!

আজ তাহার প্রাণ কিসের এক গভীর যাতনায় থাকিয়া থাকিয়া তাই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিল, নীহার বাবু যদি সত্যই তাহার ভাই হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে ফেলিয়া কি তাহারা চলিয়া আসিতে পারিত; কখনই না! প্রচ্ছন্ন বেদনাকে বুকে চাপিয়া রাখিয়া ডলি বসিয়াছিল, কিন্তু মায়ের অকৃত্রিম স্নেহাশ্রুবিন্দু যখন সহসা ঝরিয়া পড়িল, সে যেন আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেও তাহার কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া বিমনা হইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

কিশোরী মনের এই যে বেদনা, পরের ছেলেকে নিজের ভায়ের মত ভালবাসিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ইহা সেই অন্তরীক্ষে বসা মহামানুষটির এক লীলা-বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নয়!

রেখা এতক্ষণ নীরবে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু তাহার এসব বিশেষ ভাল লাগিতেছিল না, বা এ-সব বিষয়ে মন দিবার ইচ্ছাও করিতে ছিলনা। তাই সে অস্থির কণ্ঠে বলিল—তোমরা এত মন খারাপ কচ্ছ কেন মা? এতে ত' কোন লাভই হচ্ছেনা বরং সেই মানুষটির অমঙ্গলই টেনে নিয়ে আস্‌ছ! মাকে ছেড়ে তিনি কখনই থাক্‌তে পারেন না। দেখ্‌বেখন হয়ত কালই এসে হাজির হয়েছেন।

মা অস্ফুট আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্ মা! সে যেন কালই ফিরে আসে!

ডলি কথা কহিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার গলায় কথা ফুটিল না। আবার চেষ্টা করিয়া বলিল—কখ্‌খনো না। যদি আসতেন, আজই আস্‌তেন তা হ'লে। তাঁর নিশ্চয় কোন বিপদ আপদ ঘটেছে।

মায়ের বুক চিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তিনি বলিলেন—কপালটা তার বড়ই মন্দ রে, তাই আজ তার লাভ ক্ষতি বিচার করবার জন্যেও রইল না কেউ। পথে বিপথে পড়ে হয়ত বেঘোরেই প্রাণটা হারাবে শেষকালে। আবেগে ও অশ্রুপূর্ণতায় মার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ওধারে দ্রুতগামী ট্রেণখানি তাহার বিপুল গতি লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যতের দিকে তাহার ঘোড়া কয়টি ছুটাইয়া দিয়াছে—কোন্ অলক্ষ্য পথে। কত ষ্টেশন আসিল, গেল—আবার কত আসিতেছে, কাহারও খেয়ালই নাই তাহা।

ডলির ইতিমধ্যে নীহারের সেই চিঠিখানার কথা মনে পড়িল। সে মাকে প্রশ্ন করিল—মাষ্টার মশায়ের সেই চিঠিখানা মা ?

মা আগ্রহভরে বলিলেন—হ্যাঁ সেটা পড়বো, কিন্তু এখন কেমন করে পড়ি ?

—কেন মা ?

মা হাসিলেন। মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত। কিন্তু তখনই যেন সে হাসি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। একটু স্তব্ধ হইয়া তিনি কহিলেন—তোরা এখন ছেলেমানুষ, সংসারের রহস্যের কথা কি বুঝবি ? এখানে মানুষ হৃদয় দেখে না, ব্যথা বোঝে না, মহত্ত্ব বিচার করে না, একঘেয়ে সমাজ-শাসনে পিষে মন এদের বিষিয়ে উঠেছে। হিংসা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা আর সন্দেহে এরা হাবুডুবু খাচ্ছে। জিব্ সাপের মত লক্‌লকে, খালি খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে ছোব্‌লাবে !

ডলি এতক্ষণ নীরবে সমস্তই শুনিতেছিল। এইবার সে কথা কহিল—সংসার ! সমাজ !! কিসের সমাজ মা ? আমরাই ত' গড়েছি সব,

ভাঙ্‌তে চাইলে আমরাই ত' পারি ভাঙ্‌তে। যে যুগে সমাজ গড়ে উঠেছিল সে যুগ চলে গেছে, এখন সাম্যবাদের সমাজ, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে পাবে না, মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না। এই যে স্বাধীনতার চীৎকার, কোথায় স্বাধীনতা! মানুষের চীৎকারই ছাপিয়ে উঠ্‌ছে, আসল জিনিষের কোথাও নেই কিছু।

স্বাধীনতা পেতে হ'লে আজ আন্‌তে হবে সেই ভাব, যাতে জাতি নেই, সমাজ নেই, সব এক। শুধু সেই দিকেই এগুতে হবে, যে পথে আছে চরম মুক্তির মহামিলনের পরিণতি, তবেই আসবে ফিরে সেই যুগ। মানুষের শান্তি, হারানো বিশ্বাস, সব ফিরে আস্‌বে। তখন সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে সত্যের বুকে, যা শাশ্বত কোন যুগে তা কখনো ম্লান হবে না।

ডলি চুপ করিল। যেন সে শান্ত, ধীর, ছোট্ট, কিশোরী নয়। আজ কি এক বস্তুপুঞ্জের আঘাত তাহার সমস্ত প্রাণধর্ম্মগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

রেখা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া দিদির কথাগুলি আগ্রহভরে শুনিতেছিল। মুখে একটি কথাও বলে নাই; কিন্তু হৃদয়ের ভিতর একটা কিসের যেন আলোড়নে তাহার সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি মুখর হইয়া উঠিল; তাই ডলির কথা শেষ হইবার আগেই সে বলিয়া উঠিল—সত্যি দিদি, এর চেয়ে সত্যি আর বোধ হয় নেই কিছু আজকের দিনে। এতদিনের জমা যে পাপ সমাজের বুকে বসে প্রতিনিয়ত ধোঁয়াচ্ছে, তাকে নতুন শাসনযন্ত্রে ভেঙে নতুন ভাবে গড়ে তোলাই এখন বেশী প্রয়োজন হয়েছে!

ডলি উৎসাহিত হইয়া বলিল—পারবি রেখা, পারবি সে কাজ? ওরে, মা কাঁদছে! এ কান্না বড় করুণ, বড় ব্যথার কান্না। এ কান্নায়

# নীহারের মা

হয়ত একদিন জ্বলে পুড়ে সব খাক্ হয়ে যাবে, রক্তস্রোত বইবে, মড়ক মহামারীতে ঘর ভরে উঠ্‌বে, ধূমকেতু দেখা দেবে, ঝড় বইবে, সমুদ্র আর সহ্য করতে না পেরে জলের প্লাবনে সব ভাসিয়ে দেবে। সেদিন যে বাঁচার কোন পথই থাক্‌বে না, বোন!

রেখার মুখে চোখে নিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। জোর দিয়া সে কহিল নিশ্চয়ই পারব! এত বড় পৃথিবীর ভার নিয়ে যে বাসুকি নীরবে বহন করছে, সে যদি সব সহ্য করতে পারে, আমরা এই সামান্য কাজটুকু পারব না? আমাদের কি সামান্য সংসারকে শাসন করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই?

ডলি শান্তভাবে বাহিরের অপস্রিয়মান গাছপালার দিকে চাহিয়া বলিল—মাষ্টার মশাইয়ের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি রেখা! তোর আমার দু'জনের মাঝেই তা আশ্চর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এইটা আমি আশা করিনি। ভগবান আমাদের সহায় হো'ন।

মা তাহাদের কথাগুলি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন। এতক্ষণে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তোদের আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোরা যেন জয়ী হোস্! এক সৌম্য, শান্ত দীপ্তিতে তাহার মুখখানি দ্যুতিমান হইয়া উঠিল।

৭

দেওঘরে দুটি মাস কাটিয়া গেল। শীতের তীব্রতা কাটিয়া বসন্তের মৃদুল বাতাস বহিতেছে। অনিলবাবু ইহার মাঝে দুই তিনবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, নিজের কাজেই তাঁহাকে দুই এক দিনের জন্য আসিতে হইয়াছিল। ধরিত্রীময়ী স্বামীর মুখে নীহারের খবর শুনিবার আশায় কতদিন উৎসুক ভাবে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কোনই প্রত্যুত্তর পান নাই। তাই একদিন সাহস করিয়া বলিলেন—হ্যাগো, নীহারের খবর কি? তার কোন্ খোঁজ খবর পেয়েছ?

অনিলবাবু বলিলেন—না। তা ছাড়া তার খবর নেবার মত সময়ও পাইনি। দু'দিন ত' ছিলুম—তা কাজ কর্ম্মেই কেটে গেছে।

ধরিত্রীময়ী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া গেলেন।

অনিলবাবু আবার বলিলেন—ছেলেটির জন্যে আমারও মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে ধরিত্রী, ছেলেটা ছিল ভাল। বেশ মনটি, সরল, উদার প্রকৃতির।

অনিলবাবুর সহানুভূতির কথায় ধরিত্রীময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। কোন প্রকারে তিনি সামলাইয়া লইলেন।

তখন ভোরের স্নিগ্ধ আকাশটিকে বেশ মনোরম বোধ হইতেছিল। শীতের তীক্ষ্ণতা কমিয়া যাওয়ার দরুণ সকলেই বেশ একটা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল। ষ্টেশনের ধারের নিকটেই এক জায়গায় কয়েকটা নীচু পাথরের ঢিবিমত পড়িয়া আছে। তাহারই সম্মুখ দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। ওপাশে পুলের নীচে দিয়া ক্ষীণ জলধারা ঝির্ ঝির্

করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সকলেই ঢিবির উপর ইতস্ততঃ ভাবে ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন।

অনিলবাবু সিগারেট ধরাইলেন। ধরিত্রীময়ী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আমাদের ত' এবার ফিরতে হবে? এখানে বেশ গরম পড়ে গেল। অনিলবাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন—হুঁ।

ধরিত্রীময়ী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—সকলেই ত' চলে গেল, যারা এসেছিল বেড়াতে?

অনিলবাবু বলিলেন—বড্ড গরম পড়ে গেল কিনা তাড়াতাড়ি।

পূর্ব্বদিকের আকাশের কোলে সোনালী রঙ্ ছড়াইয়া সূর্য্য উঠিল। প্রথম সূর্য্যকিরণ ধরিত্রীময়ীকে অপরূপ ভাবে সাজাইয়া তুলিয়াছিল। সে রূপের এ মরজগতে যেন তুলনা নাই। চারিদিকের অপরূপ শান্তি সৌম্যতার মধ্যে ধরিত্রীময়ীকে যেন দেবীর মত বোধ হইতে লাগিল।

রেখা ও ডলি দুইজনে বসিয়া সম্মুখের শীর্ণ জলস্রোতটির দিকে তাকাইয়া নিজেদের গল্পগুজবেই মাতিয়াছিল। ওদিকের ষ্টেশনে একটি মালগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইতে কত মালপত্র তোলা হইতেছে। মাঝে মাঝে মোটর ও গাড়ীর শব্দ সে স্থানটির নির্জ্জনতা ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

ওধারে অনিলবাবুর ধূমপান শেষ হইয়া গেল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—চলো, ওঠা যাক্ এবার, রদ্দুর বেড়ে যাচ্ছে।

ধরিত্রীময়ী সম্মতি জানাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। নীহারের কথার পর হইতেই ধরিত্রীময়ী লক্ষ্য করিয়াছিলেন—স্বামীর মনোভাব সামান্য বদলাইয়া গিয়াছে। সত্যই তাই, ধরিত্রীময়ীর অনুমান মিথ্যা নয় এতটুকু। নীহার আর ধরিত্রীকে লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়াছিলেন

তিনি। এই কয়দিন ধরিয়া তাহার মনে যথেষ্ট তর্ক, মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সত্যই কি নীহার ধরিত্রীকে মায়ের মত ভাবিয়া শ্রদ্ধা করে, ধরিত্রীও নিজের ছেলের মত ভাবে নীহারকে, ইহা নারীত্বেরই কি অন্য একটি কোমল দিক—না অন্য কিছু! অনিলবাবু তাই আজ সকালে বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ডলি ও রেখাও সেই নির্জনস্থানে বসিয়া তাহাদের প্রসঙ্গ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যতই তাহারা এই ব্যাপারটিকে সামান্য ভাবিতে চেষ্টা করে, ততই তাহা যেন বুকে আসিয়া গভীরভাবে আঘাত করে। এ সমস্যার যেন মীমাংসা নাই! বিপুল বেদনার ব্যথা রাশিকৃতভাবে যেন সমস্ত বুকখানি অধিকার করিয়া আছে। এত অপমান তাহাদের পক্ষে? মানুষ হইয়া যাহা মানুষের উপকারেই লাগিল না, তাহা হইলে সমাজ কিসের? মানুষেরই সমাজ ত' ইহা, পশুর ত' নয়! এ অত্যাচার অবিচারের সীমা নাই নাকি! নিশ্চয়ই, প্রতিকার চাই ইহার। এ আল্‌গা বাঁধন তাহারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে, আবার নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। এ ভিত্তিহীন সমাজের কোনরূপ অর্থই হয়না। কোথা হইতে তাহাদের নবীন সতেজ প্রাণে বিদ্রোহের সুর জাগিয়া উঠিয়াছে। নবারুণের আলোক তাহার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে যেন। উঠিবার পথ ধরিতে পারিলেই তাহারা যাহা পুরাতন তাহাতে আগুন ধরাইয়া নবীনের সৃষ্টি করিয়া দিবে।

পাথেয়ের সঞ্চয় হইল, কিন্তু পথ কই? কোনপথ ধরিয়া চলিলে সেই ঈপ্সিতকে পাওয়া যাইবে। যদি পথ ঠিক রাখিয়া চলিতে না পারে তাহারা, কর্ত্তব্যের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া পিছাইয়া পড়ে যদি, ঘটনার স্রোতে যদি তাহারা নিরুদ্দেশে ভাসিয়া যায়, তখন? তাই

# নীহারের মা

অনেক ভাবিয়া সে রেখাকে কহিল—আমার ভয় হচ্ছে রেখা, পাছে নিজেদেরই না ক্ষতি করে বসি! নিজেদের মানে, তোর আমার নয়, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তাঁকেই না আবার জড়িয়ে ফেলি!

রেখা বলিল—না দিদি, তেমন কাজ করে দরকার নেই, বরঞ্চ ভেবে-চিন্তে কাজ করা যাবে—যাতে কোন দিকে না গোলযোগ হয়।

ডলি উত্তর দিল আমিও ভাব্‌ছি তাই। তাড়াতাড়ি করার চেয়ে মায়ের চোখের জল না বাড়িয়ে বরং যুক্তি দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে হিসেব করে কাজটা করাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

রেখা কথা কহিতে যাইবে, এমন সময় অনিলবাবু ডাকিলেন। তাহার আর কথা তোলা হইল না। সকলে বাঙ্‌লোয় প্রবেশ করিল।

নীহারের চিঠি পড়িয়া আবার মার মনকে এই সংসারের সকল আসক্তি হইতে দূরে, বহুদূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। সে চিঠির উত্তর তিনি কেমন করিয়া দিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহার আজও মনের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতা সময়ে অসময়ে পীড়াই দিতেছিল। তবুও মা চলিয়াছেন, কর্ত্তব্য-কঠিন সংসারের প্রতিটি কার্য্য করিয়া, স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে তুষ্ট করিয়া ন্যায় ও সত্যের ধর্ম্মধ্বজা বহন করিয়া, বিবেক বাসনায় সমস্ত স্বার্থসিদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া। সর্ব্বদাই যেন নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতে চাহেন, কেহ যেন তাঁহার ব্যথার উৎস দেখিতে না পায়।

## ৮

অনেকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া নীহার চুপটি করিয়া বসিয়াছিল তাহার ঘরে। বাহিরের আকাশের প্রচুর অবাধ আলো ঘরের মাঝে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে অকুণ্ঠভাবে। সে প্রাচুর্য্যের সহিত যেন এতটুকু সামঞ্জস্য নাই আজিকার এই দৃশ্যের। হায়রে মানুষ, হায়রে তাহার ঘর-বাধার নেশা! আঘাতের পর আঘাত খাইয়াও তাহার চৈতন্য হয় না, পুরানো বাসা ভাঙিয়া আবার সে নতুন বাসা বাঁধে, আবার নতুন আশা উদ্দীপনা লইয়া। বাহিরের ঐ যাযাবর পাখীর দলের মতই তাহার ঘর অনেক দিন আগে ভাঙিয়াছে, আজও সে তাহাকে জোড়া লাগাইয়া তৈয়ারী করিতে পারিল না।

ঘরের মধ্যে নীহার দৃষ্টি ফিরাইল। খাটের উপর একরাশ ধূলার মধ্যে সে বসিয়া আছে। আস্‌বাবপত্র এদিক সেদিক ছড়ানো, ঘরময় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা, মানুষের জীবনের সহিত যেন সামঞ্জস্য নহে এতটুকু। এ বাসা দেখিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে, ঘর-বাঁধার নেশা তাহার দূর হইয়া যায়। নীহারের চোখে জল আসিল।

ঘর খোলার শব্দ পাইয়া বোধ হয় সুনীতি ছুটিয়া আসিলেন— কিগো, ঠাকুরপো বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে ?

নীহার ম্লান হাসিল বৌদির দিকে চাহিয়া।

—বাইরে কোথাও আর সুবিধে হ'ল না বুঝি, তাই আবার এসে ঘর পাতার চেষ্টা করছ ?

নীহার সেইভাবেই জবাব দিল—জানই ত' দেখ্‌ছি সব কিছু !

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া সুনীতি কহিলেন—শুধু তাই নয়, আরও অনেক জানি।

—কি ?

—কি ? তোমার দাদা বল্‌তে বলে দিয়েছেন, আর তোমাকে তিনি বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন না।

নীহার কোন জবাব দিল না। চুপ করিয়া শুনিল কথা কয়টি। সুনীতির এতেও স্বস্তি বোধ হইল না। তাই তিনি আরও বলিতে লাগিলেন—বিনা স্বার্থে মানুষ কতকাল আর হাতী পোষে ?

এবারেও নীহার জবাব দিল না। এমন ভাবে অপমান কেহ তাহাকে কোনদিন করে নাই। বুক ঠেলিয়া তাহার কান্না পাইতে লাগিল। কোথায় তাহার এতদিনের অনুপস্থিতিতে সকলে সমবেদনা জানাইবে, তাহার বদলে তাহার অদৃষ্টে একী নিষ্ঠুর আচরণ ! হায়রে, সমবেদনাও তাহার পক্ষে বেদনা ছাড়া আর কিছুই বহন করিল না। ভগবানের কি নির্ম্মম পরিহাস ! শুধুই তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়াছে তিল তিল করিয়া অপমান আর অত্যাচার সকলের বুকে। বড় ভাই—হাঃ, হাঃ, হাঃ ! আজ সেও নিজের স্বার্থ বাছিয়া লইয়াছে। দুঃখের বদলে নিমেষে সমস্ত সংসারের উপর এক তীব্র বিতৃষ্ণা ও গ্লানিতে তাহার সর্ব্ব দেহ বিকৃত হইয়া উঠিল। আল্‌না হইতে জামা গায়ে দিয়া সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক বিচিত্র অনুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। জগতের উপর তাহার যে ঘৃণা তাহা নয়—মনের মধ্যে যেন অত্যন্ত অসহায়তা বোধ করিতেছে সে। এ জগতে তাহার কেহ নাই, এতবড় পৃথিবীতে তাহার মুখ কেহ চাহিবে না ! হায় রে,

## নীহারের মা

আপন যে সেও পর বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল! আর তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কি প্রয়োজন? লক্ষ্যভ্রষ্ট, উদ্দেশ্যহীন পথিকের মত সংসারের পথে পথে এ যাযাবর বৃত্তি আর কতদিন ভালই বা লাগে?

হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার মা আছেন। এ সংসারে তাহার নিজের বলিতে একমাত্র তিনিই। যদিও তিনি জানেন এই অভাগা ছেলেটি তাহার কেহই নয়, তবুও এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই তিনি অন্তরের দিক হইতে। পরের ছেলে জানিয়াও বুকে টানিয়া লইয়াছেন। মায়ের কথা ভাবিয়া তাহার দুই চোখে জল আর বাধা মানিল না। তারপর মনে হইল এতদিনে মা বোধ হয় দেওঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার ভাবিল যদি আসিয়াই থাকেন ত' এতদিন কোন খোঁজ নেন নাই কেন? মনে পড়িল সে যে মাত্র আজই বাড়ী ফিরিয়াছে জ্যোৎস্নার ওখান হইতে। নিশ্চয়ই মা কল্পনাথকে পাঠাইয়াছিলেন, কল্পনাথ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

অনুমান তাহার মিথ্যা নয়। মা সেদিনেও কল্পনাথকে পাঠাইয়াছিলেন। কল্পনাথ ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছিল যে নীহারবাবু এই মাত্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

এমন সময় বাহিরে কে যেন ডাকিল—ডলি,—ডল্।

মা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—তোদের মাষ্টার মশায়ের মত গলা না-রে ডলি?

ইতস্ততঃ করিয়া ডলি বলিল—আমারও তাই মনে হচ্ছে, মা,—দেখব বাইরে গিয়ে?

রেখা কাহারও কথার অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল ও পরক্ষণেই নীহারকে সঙ্গে করিয়া টানিয়া লইয়া আসিল।

# নীহারের মা

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। মা স্তব্ধ হইয়া নীহারকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—যেন কত দিনের হারানো পরশপাথর ফিরিয়া পাইয়া সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লইতে-ছেন তাহাকে ; আর নীহারের যেন সব ব্যথা, সব বেদনা, বলিবার যত কিছু কথা, সব কিছু কি যেন এক বিরাট বিস্ময়ের সমুদ্রের সম্মুখে আসিয়া তাহার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ম্লান হাসিয়া নীহার মাকে প্রণাম করিল—ভাল আছেন ত' মা? মায়ের চোখের দৃষ্টি যেন অসীম বৈরাগ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। মা সে কথার জবাব দিলেন না। ডলি ও রেখার মাথায় হাত রাখিয়া নীহার প্রশ্ন করিল—তোমরা ভাল ছিলে ত'?

উত্তরে উভয়ে তারা ঘাড় নাড়িল। কাহারো মুখে কথা নাই। আজিকার মিলনের এই বিরাট আনন্দোৎসব কিসের এক ম্লান ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কাহারো তাহা বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই।

নীহারের সমস্ত অন্তর এই করুণ বৈরাগ্যটুকু অপরিসীম বেদনার সহিত যেন অনুভব করিতে পারিল। মায়ের পানে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া কহিল—একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন, না মা?—

মা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কী বল্‌ছিস্ নীহার? তোকে ভুলেছিলুম আমি? জানিস্, তোর অভাবে আমার সব আয়োজন নষ্ট হয়ে গেছে? তোর না যাওয়াতে কত দুঃখ পেয়েছি আমি।—অপরিসীম অভিমানে তাঁহার দুই চোখ পুরিয়া জল আসিল।

নীহারের যেন সব বেদনা, সব গ্লানি এক নিমেষে দূর হইয়া গেল। স্বাভাবিক কণ্ঠে সে কহিয়া উঠিল—আমায় মাপ করুন মা? মার দুই চোখে যেন বেদনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে যেন তাঁহার রোমাঞ্চ জাগিয়াছে। নীহারকে তিনি করুণ চোখে দেখিতে লাগিলেন—সে সুন্দর

## নীহারের মা

দেহ নাই, শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ, যেন কতদিন রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজের সব হারাইয়াও জয়লাভ করিতে পারিয়াছে। নীহার অপরাধীর কণ্ঠে কহিল—আমার অনেক কথা আছে মা।

সে কথা মায়ের কানে যাইল না। উদ্বেগের স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন—তোর খাওয়া হয়েছে ত'? এমন রুক্ষ চুল ও এমন রোগা রোগা দেখাচ্ছে কেন রে?

নীহার যেন তাহা শুনিতে পায় নাই। আবার সে বলিল—আমার অনেক কথা বলবার আছে মা!

মা কণ্ঠে নিশ্চয়তা আনিয়া বলিলেন—আমি ঠিক বল্‌তে পারি তোর খাওয়া হয়নি নীহার! আমার চোখকে তুই ফাঁকি দিতে পারবি না কখ্‌খোনো।

নীহার বেদনার হাসি হাসিল। কিন্তু সে আর কোন কথা বলবার আগেই মা কোন কথায় কান না দিয়া কল্পনাথের সাহায্যে খাবার আনাইয়া নিজে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন নীহারকে। খাইতে খাইতে নীহার সব কথা বলিয়া গেল, কেবল জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে কোন কথাই মাকে জানাইল না উপস্থিত।

মা সব শুনিয়া শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কথা শেষ করিয়া নীহার আবার বলিল—তবে এখনও বেশী ততটা হাঁটাহাঁটি করতে পারিনা, শরীর বেশ তুর্ব্বল!

মা বলিলেন, বিশ্রাম না পেলেই বা চলে কি করে, যন্ত্র ত নয়। যন্ত্রও বিশ্রাম চায়, তা এ-তো মানুষের শরীর! এই যে বেলা তিনটে পর্য্যন্ত না খেয়ে, না চান করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, এতে কী শরীর বাঁচে?

তারপর ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিলেন—সময়ে চান্ খাওয়াটাও কি করতে পারিস্ না বাবা ?

নীহার গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। কহিল—তারও একটা ভাগ্য চাই মা।

মা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন—মানে ?

ব্যথিত কণ্ঠে নীহার বলিল—মানে ত খুব সোজা' মা! জগতে যার কেউ নেই, তাকে খিদের অন্ন কে জোগাবে ? একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার শুরু করিল—দাদা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সেখানে আর আমার সুবিধে হবে না বিশেষ! করুণ এক অপূর্ব্ব হাসিতে তাহার সমস্ত মুখখানি মলিন হইয়া উঠিল। তারপর কহিল—এ শুধু অদৃষ্টের দোষ! জন্মাবধি যে ছাপ মেরে পৃথিবীর বুকে ভগবান ছেড়ে দিয়েছেন, তাকে এড়িয়ে চল্‌ব কেমন করে ? তাই মানুষও ভালকাজের প্রতিদান দেয় না, যাদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি, তারাও অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে ওঠে। তারাই অপমান, লাঞ্ছনার শেষ রাখে না, তারা ভুলে যায় আমার বিবেক আছে, অনুভূতি আছে। নীহার করুণ মুখে মায়ের দিকে তাকাইল—বড় ব্যথার সে চাহনী। বেদনা যেন গলিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাতে। ব্যর্থতার অসীম গ্লানির বোঝা যেন রাশিকৃত হইয়া দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। নীহার যেন এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

নীহারের এরূপ ভাব মায়ের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারিল না। তাই তিনি স্নেহসূচক স্বরে বলিতে লাগিলেন—ওর জন্যে ভাব্‌না কিরে তোর! ওরা তোকে নিঃস্ব করেছে বলে আমি ত' তা পারব না। আমি যে তোর মা! সমস্ত পৃথিবী যদি তোকে বঞ্চনা করে, আমি আমার বুকের সব সম্পদ দিয়ে তোকে আগলে রাখব। যেদিন দেখবি আমার

ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে, সেদিন বুঝিস্ এ পৃথিবীর কাজ ফুরিয়েছে তোর। আর কোন দরকার নেই তোর এখানে।

ক্রোধের আতিশয্যে মায়ের মুখখানি রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। যেন মা দুর্গা রণে যাইবার পূর্ব্বে দৈত্যের দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইয়াছেন। নীহার সে মুখের পানে তাকাইতে সাহস করিল না। নত হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইল। বলিবার মত আজ অনেক কথাই ছিল তাহার; কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে বিপ্লব ক্ষণেক পূর্ব্বেই ঘটিয়া গেল, তাহার উপর হস্তক্ষেপ কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। মনে মনে তাই সে কেবল এই প্রার্থনাটুকুই জানাইল যে, স্নেহ-কাঙাল আমি। মাতৃ-মন্ত্রের হোমাগ্নি জ্বেলে তাই বসে আছি। আমার ব্রতকে এবার আহুতি দিয়ে শেষ করব। তোমারই মূর্ত্তি বুকে ধরে দিন কাটিয়ে দেই; আমার কোন চিন্তা নেই, অন্য কোন কিছুই ভাল লাগেনা। তাই আজ বলবারও কিছু নেই। শুধু তুমি আমায় স্মরণ রেখো। তোমার রাজ-সিংহাসনের নীচে বসেই আমি ধন্য হয়ে যাব, এ-জীবনে তার বেশী আর কিছু আশা করিনা। আশীর্ব্বাদ কোরো পরজন্মে যেন আর এ অভিশাপ বুকে নিয়ে বেড়াতে না হয়!

নীহারকে নীরব দেখিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন—আমার এ রূপ নিজস্ব নয়, সমস্ত মায়ের জাতের রূপই এই। তবু ছেলেরা মায়ের বুকে আঘাত করে! সেই আঘাত যে কতখানি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে মায়ের বুকে, তাঁকে কত সহিষ্ণুতা আর ধৈর্য্যে সেই ঘা সারাতে হয়, তা জান্‌বার দরকারও বোধ করে না কেউ।

নীহার আর সহ্য করিতে পারিল না। প্রতিবাদের স্বরে সে বলিয়া উঠিল—না মা, তা নয়। ও কথা আপনি ফিরিয়ে নিন্। কয়েকজনের

দোষে সমস্ত ছেলের দলকে আপনি দোষ দিতে পারেন না। এমনও হয় যে, ছেলে তার সবটুকু বিলিয়ে দিয়েও মাকে ফিরে পায় না, তার বদলে শুধু অবহেলাই পেয়ে যায়। মানুষের এই যে মন, এর-ওপর কেউ কোনদিন দাগ কাট্‌তে পারে না, যদি না সে নিজে তাকে বিচলিত করে। বিশ্বাসের সত্যি আবরণকেও সকলে গ্রহণ করতে পারে না; তাই তারা অবিশ্বাস আর অন্ধতার দ্বারাই সংসার জয় করতে চায়। নৈরাশ্যকে তাই তারা তাড়াতে পারে না। অবিশ্বাসের নেশা তাদের পেয়ে বসে।

মা নীহারের কথাগুলি নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া বিস্মৃত প্রায় এক অতীত অধ্যায়কেই স্মরণ হইল তাঁহার। জীবনের সে অধ্যায়কে কেউ ভুলিতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। তাই তিনি একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সংসারে যারা চুপ করে মনে জোর রেখে সব সহ্য করে যায়, জীবনে তাদের জয় হবেই। যতই দুঃখু তারা পাক্ না কেন, যত অনাদর উপেক্ষা তাদের অদৃষ্টে ঘটুক না কেন, শেষকালে দেখ্‌বি নিজেদের মন আর বিশ্বাসের জোরেই সব কিছু সত্যি হয়ে গেছে। একটু ভাবিয়া পরে আবার বলিলেন—আমার কথা যে ভুল নয় তার প্রমাণ পাবিই একদিন! বলিয়া তিনি নিজের মনের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। শরতের শিশিরের মত তাঁহার চোখের কোণে জল চিক্-চিক্ করিয়া উঠিল।

এই কথার যে একটা পুরাণো স্মৃতি আছে এবং তাহা যে কত সত্য, তাঁহার মত কেই বা তাহার হিসাব রাখিয়াছে! প্রথম জীবনে যখন শ্বশুরের ভিটায় পা দিলেন, তখন তাঁহার মনের শঙ্কা জড়তা কাটে নাই, স্বামীর মুখের পানে চাহিতে সাহস হয় না, সর্ব্বদাই অপরাধিনীর মত

ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যেন দিনগুলোকে কোনপ্রকারে পার করিয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাইবেন। দ্বিধা-শঙ্কিত হৃদয়ে স্বামীর নিকট যাইতে গিয়া, কি যেন বলিতে গিয়া, কি যেন দাবী জানাইতে গিয়া বলিতে পারেন নাই, এক পা এক পা করিয়া পিছু হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাহিরের দিক হইতে তাঁহার আদর যত্নের ত্রুটি স্বামী রাখেন নাই; কিন্তু ধরিত্রীময়ীর ভিতরকে তিনি ভালোবাসিতে পারেন নাই। তাই বাহিরদিকে তাঁহার প্রকৃতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল।

ঘরের লক্ষ্মীকে এমনভাবে পায়ে ঠেলিয়া, তাহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া অধঃপাতের কদর্য্যতায় যাহারা সমস্ত শরীর বিষাইয়া ফেলে, অনু-তাপের সীমায় পৌছিয়া তাহাদের যাতনার অবসান ঘটিবে না। সেদিন এই বলিয়াই তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। আজ তাহা ব্যর্থ হয় নাই। অবিবেচক মানুষ যে আবরণের মুখোস পরিয়া সংসারে চলা-ফেরার পথে কত যে অন্যায় করে কে তাহার হিসাব রাখে? বিশ্বের বুকে এই যে পাপ, এই যে সমস্যা, মীমাংসা যে কোথায় এবং কতদূরে সৃষ্টির রহস্য সমাচ্ছন্ন, জোট্ পড়া সুতার মত গ্রন্থিল হইয়া ধাঁধা পাকাইয়া চক্ষুকে পীড়া দিয়া থাকে,—তাহার রহস্য ভেদ করা সাধ্যাতীত না হইলেও মানুষ অসাধ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া পথ চলিতে থাকে।

অতীতের সে সব কথা স্মরণে আসিলে দুঃখ বোধ হয় তাহার। যদিও সে সব দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে, তবুও মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সেদিকে নির্ম্মল মনের ভিত দৃঢ় করিয়া গাঁথিয়া ছিলেন বলিয়াই এত আঘাতেও ভাঙিয়া পড়ে নাই তাহা, শেষ পর্য্যন্ত তাহারই উপর ভবিষ্যৎ জীবনের সৌধ গড়িতে পারিয়াছেন।

## নীহারের মা

বিকাল হইয়া আসিয়াছিল। অপরাহ্নের মৃদুমধুর বাতাস আসিয়া দোলা লাগাইতেছিল যেন।

নীহার উঠিয়া পড়িল।—বলিল—চল্‌লাম মা, আজ।

মা বাধা দিলেন না।—বলিলেন—বেশ, কিন্তু রাত্রে আজ এখানে থেকে খেয়ে যাবি। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজ খেতে হবে তোকে এখানে।

নীহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল—আপনার অসীম দয়া, এ আমি জীবনে ভুলবো না, তবু আমি আপনাকে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আন্‌বো না মা?

—কিসের ঝঞ্ঝাট বল্ ত'? আমার কাছে খাবি তুই, আমি বিপদে পড়ব এতে? পথে পথে তুই না খেয়ে ঘুরে বেড়াবি, আর আমি সতেরো ব্যঞ্জন করে খেতে বস্‌ব? সে আমি পারব না নীহার। তোকে আমার কথা রাখ্‌তেই হবে, কোন কথা শুন্‌বো না তোর।—বলিতে বলিতে মায়ের গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল। গভীর স্নেহের আতিশয্য তাঁহার বুঝি বা বুক ছাপাইয়া চোখে আসিয়া পড়ে। তাই কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তিনি।

মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া নীহার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—ইহজীবনে যদি সত্যিই আপনাকে মা বলে ডেকে থাকি—যদি সত্যিই আমার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ না হয়—তবে একদিনকার জন্যে সব জমা রইল মা। সেদিন যেন কৃপণের মত ফিরে যেতে না দেখি আপনাকে?

মা হাসিতে লাগিলেন, চোখে জল ঠোঁটে হাসি। আনন্দ তাঁহার যেন আর সহ্য হইতে ছিল না, চোখের জলে তাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বলিলেন—বল্ না কি চাস্ তুই? আজই বল্, এক্ষুণি।

## নীহারের মা

—আজ নয়, বলার সময় যদি পাই তবে সেদিনের জন্যে তোলা রইল। সময় না এলে সে কথা এ জীবনেও শুন্‌তে পাবেন না আপনি। ঝড়ের মত নীহার নামিয়া গেল।

স্থির হইয়া মা জানালায় দাঁড়াইয়া রহিলেন আবিষ্টের মত। পশ্চিম সাগরে নিমজ্জমান সূর্য্যের মত অনেক কিছু ডুবিয়া গিয়াছে তাঁহার। নীহার আজ এ কিসের ইঙ্গিত করিয়া গেল ?

৯

আবার রাত্রি আসিয়াছে। মা নীহারকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইতে ছিলেন—এতখানি বয়সের মধ্যে নীহারকে এমন আদর করিয়া কেহ খাওয়ায় নাই। খাওয়াটা যে কত তৃপ্তির, কত আনন্দের রস যে তাহাতে সঞ্চিত আছে, সে আজ তাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছিল। তাহার মত হতভাগ্যের আজ যেন নূতন করিয়া জন্ম হইল। তাহার রোপিত আশাতরু যে এত শীঘ্র ফলবতী হইবে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। আনন্দের আতিশয্যে সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে ইহাই ভাবিতে লাগিল পৃথিবীতে সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি ছেলের ভাগ্যে মায়ের দল না থাকিত, তবে কি অবস্থা ঘটিত তাহাদের? জলবুদ্বুদের মত কোথায় সব মিলাইয়া যাইত, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাইত না কেউ।

এমনি সময় অনিলবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ধরিত্রী-ময়ী তাহাকে দেখিয়া মাথায় আঁচল তুলিয়া দিলেন। কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সর্ব্বশরীরে তিনি যেন অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলবাবু বলিলেন—নীহার যে, এতদিন কোথায় ছিলে?

নীহার উত্তর দিল—এখানেই ছিলাম ত'!

—এখামেই?

তাড়াতাড়ি নীহার বলিল—হঁ্যা, এখানেই ছিলুম, তবে একটা বিপদে পড়ে গিছলুম।

বিপদ, কিসের ? অনিলবাবু ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

নীহার একে একে সব জানাইল তাঁহাকে। সব শুনিয়া অনিলবাবু বলিলেন—দাদার সঙ্গে শুন্‌লাম ঝগড়া হয়ে গেছে, তাহ'লে এখন খাবে বা থাক্‌বে কোথায় ?

নীহার বলিল—আমার আবার থাকাথাকি ? কোথাও হলেই হ'ল।

এই অসহায় ছেলেটির দারিদ্র্যক্লিষ্ট রূপ অনিলবাবুর চোখে যেন স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। তাই তিনি তাহার দিকে ব্যথা ভরে চোখে চাহিয়া বলিলেন—তুমি খাওয়া দাওয়াটা কাল থেকে এখানেই সেরে নিও। তারপর ধরিত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ওর সেই ব্যবস্থাই কোরো ধরিত্রী—

রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আর তিনি দাঁড়াইলেন না।

নীহারেরও খাওয়া শেষ হইয়াছিল। মাকে বলিয়া সেও উঠিয়া পড়িল।

## ১০

এবারের বর্ষাটা নীহারের ভাল কাটিতেছিল না। বর্ষার আরম্ভেই তাহার অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। কালও রাত্রে জ্বর আসিয়াছে,— নীহার সকাল বেলা চুপ করিয়া তাই বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া শরীর অত্যন্ত অবসন্ন, উঠিয়া যেন দাঁড়াইতে পারা যায় না।

চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। নীহার খুলিয়া দেখিল— জ্যোৎস্না লিখিয়াছে—

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাইনি। আশা করি ভালই আছ! তোমার আদেশ মত আমি সন্ন্যাসিনী বেশেই তোমার ইচ্ছা পালন করছি। মাঝে মাঝে মন বড় অস্থির হয়ে পড়ে। ঐ পা দু'খানির জন্য অত্যন্ত লোভ হয় মাঝে মাঝে। চিঠি লিখে তোমাকে বিরক্ত করতাম না; কিন্তু আজ আর নিজেকে যেন প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না। তুমি আমার দেবতা—তোমার পায়ের স্পর্শ-ই আমাকে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দেবে। বেশী লিখ্‌লাম না। আশাকরি এ কৃপা থেকে বঞ্চিত হব না। ইতি,

চরণাশ্রিতা

জ্যোৎস্না।

নীহার সমস্ত চিঠিখানি আদ্যন্ত পড়িল। পড়িয়া মাথায় তাহার এক ফন্দি জাগিল। সে দেখিবে সত্যই ধরিত্রীময়ী তাহাকে একান্ত আপনার করিয়া ভালবাসেন কিনা? সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

জ্যোৎস্নার সহিত যেমন করিয়া হউক দেখা করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ব্বল দেহটা যেন কিছুতেই নড়িয়া-চড়িয়া কাজ করিতে চাহে না। তবুও নীহার চেষ্টা করিয়া উঠিয়া আল্‌না হইতে জামাটা গায়ে চড়াইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্নাদের বাড়ী যাইয়া প্রথমেই তাহার দেখা হইল সরকার মশায়ের সহিত। নীহারের এইরূপ মলিন বেশ-ভূষা ও শীর্ণ আকৃতি দেখিয়া প্রথমে তিনি নীহারকে চিনিতেই পারিলেন না। তারপর তাহার গলার স্বর চিনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—নীহারবাবু, এত রোগা হয়ে গেছেন আপনি! ম্লান হাসি হাসিয়া নীহার জবাব দিল—ঠিকই ধরেছেন। প্রায় কুড়ি বাইশ দিন রোজ জ্বর হয়ে হয়ে শরীরটা এবার ভেঙ্গে পড়েছে। আজ উঠেই জ্যোৎস্নার চিঠি পেলুম।

সরকার মশাই বলিলেন—বেশ করেছেন। ওপরে যান্, জ্যোৎস্না-মা বোধ হয় পূজোর ঘরেই আছে।

সদর পার হইয়াই পড়ে বড় উঠান। তাহার ধার বাহিয়া বেশ বড় বড় বাঁধান সিঁড়ি। এখনও নীহারের কাছে সেদিনের কথা সব স্পষ্ট মনে পড়ে। কোথা হইতে যেন সামান্য বেদনা অনুভূত হয় তাহার সহিত! কতদিন পরে আবার সে প্রবেশ করিল এখানে। চলিয়া যাইবার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। তবুও সেদিনকার সন্ধ্যাকে নীহারের ভুলিতে বহুদিন লাগিবে।

উপরে উঠিয়াই সম্মুখে বড় হলঘর। সে ঘর ছাড়াইয়া নীহার আর একটি ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ভৃত্য গৌর ছুটিয়া আসিল—কে আপনি, কাকে চান? গৌর সবে সেদিন বাহাল হইয়াছে।

অপরিচিত এই দীনবেশী যুবকটিকে দেখিয়াই তাহার মন সন্দেহে দুলিয়া উঠিল।

নীহার জবাব দিল—জ্যোৎস্নাকে ডেকে দাও ত' একবার।

গৌর অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—কাকে,—দিদিমণিকে ?

বিরক্ত হইয়া নীহার বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাঁকেই। যাও, ডেকে দাও।

গৌর দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নীহার আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ঘরের বিছানায় শুইয়া পড়িল। অনশনক্লিষ্ট দেহে এমন শক্তি নাই যে দাঁড়াইয়া থাকে।

নীহারকে বিছানায় শুইতে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া মেচাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল, ছাড়িবার পাত্র সে নয়। অথচ নীহারকে একা রাখিয়া তাহার ভিতরে যাইতে সাহসও হইতেছে না।

চেঁচামেচি শুনিয়া জ্যোৎস্না সেদিকেই আসিতেছিল গৌরকে ধমকাইয়া বলিল—তোর চীৎকারের জ্বালায় কি একটু পূজোও করতে পারব না গৌর ? কি হয়েছে শুনি ? ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকিতে যাইবে, গৌর বাধা দিয়া বলিল—যেও না দিদিমণি, কে একজন এসে শুয়েছে বিছনায়,—আবার বলে দিদিমণিকে ডেকে দে তোর।

জ্যোৎস্না বলিল—তা থাক, চল্‌ত দেখি লোকটাকে। বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং অদূরে নীহারকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া বলিল কখন এলে ?

—কে ? নীহার জাগিয়া উঠিল। বিছানায় শুইয়াই তাহার অবসাদ ভরে চক্ষু দুটি ভরিয়া আসিয়াছিল।

জ্যোৎস্না জবাব দিল না। চুপ করিয়া ম্লান হাসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

## নীহারের মা

নীহার চোখ খুলিয়াছিল। জ্যোৎস্না সত্যই যেন ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন পূর্ণজ্যোতি অথচ তীব্রতা নাই, স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে দেবী প্রতিমার মত দেখাইতেছে। সে চঞ্চলতা নাই, সে উগ্রতা নাই, উদ্দামতা ভরা যৌবন যেন কিসের প্রভাবে শান্ত সমুদ্রের রূপ ধরিয়াছে। উচ্ছ্বাসের লেশ নাই তাহাতে।

আজ তাহাকে দেখিয়া নীহারের বড় ভাল লাগিল। রমণীর যা হওয়া উচিত, সেরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে,—জগতের নারী সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে, জীবনের প্রথম চাঞ্চল্যে কখনও তাহাদের পথভ্রান্তি ঘটিবে না,—জ্যোৎস্না যেন তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সম্মুখে।

নীহার বলিল—বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কেমন আছ?

—ভাল। তুমি কেমন আছ? শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে,—আর আমাকে জানাও নি একবার!

হাসিয়া নীহার বলিল—পুরুষ মানুষের শরীর এত সামান্যে কি খারাপ হয়। আর তার জন্যে ভাবনা নেই। একটু সাবধান হলেই সেরে যাবে। যাক্ সে কথা,—হ্যাঁ—

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া জ্যোৎস্না মুখ তুলিয়া চাহিল।

নীহার বলিল—একটা কাজ করতে হবে জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না অধীর হইয়া কহিল—বলো আমায় কি করতে হবে? তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি!

নীহার বলিল—একটু বিশ্রাম জ্যোৎস্না। তারপর হঠাৎ অধীর হইয়া বলিল—না, না বিশ্রামের আমার দরকার নেই—

বাধা দিয়া জ্যোৎস্না বলিল—দরকার আছে বৈকি। এতদিনের

অসুখে শরীর তোমার ভেঙ্গে পড়েছে, তাকে দেখা আগে দরকার, তারপর তোমার মন।

অধৈর্য্য হইয়া নীহার বলিল—সবার আগে মন জ্যোৎস্না, মনই সবার ওপরে। অভিলাষ সিদ্ধির তীরে এসে সামান্য দুর্ব্বলতার জন্যে তাকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। সংসারে আমার আসক্তি নেই, স্নেহময়ী মা আমার জীবনে সত্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ও যে কত বড় সত্য তা আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না—ওর জন্যেই আমি পাগল।

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে কহিল—তোমার তুলনা নেই। তোমার পথে আমায় সঙ্গী করে নাও—

আনন্দে নীহারের মন নাচিয়া উঠিল—তুমি পারবে জ্যোৎস্না ?

ব্যাকুল হইয়া জ্যোৎস্না বলিল—পারব, পারব, একশবার পারব।

নীহার জ্যোৎস্নার হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিল—শোনো জ্যোৎস্না কি তোমায় করতে হবে।

বলো—

উত্তেজিত হইয়া নীহার বলিল—এমন আয়োজন করো যা মানুষ কোনদিন করে নি। আজ আমার অন্তরের মণিকোঠায় মায়ের মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করব, তুমি হবে আমার সঙ্গী। অন্তরের বেদীমূলে মাকে আজ বসাব। উৎসবের ত্রুটী যেন না হয় জ্যোৎস্না।

—ত্রুটী আমি হতে দেব না! ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পাহাড়ের মত অভিমান নীহারকে আজ পাইয়া বসিয়াছে। শীর্ণ শরীরে ধমনীর রক্তস্রোত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু ভাল লাগে না তার। কবে আসিবে এমন দিন, যেদিন মায়ের স্নিগ্ধ পীযূষ ধারায়

তাহার সমস্ত দেহ মন ভরিয়া উঠিবে, কবে সে জীবনের এই অসত্য গ্লানি হইতে মুক্তি পাইবে? পথ কৈ, আলো কৈ? নীহার আর ভাবিতে পারিল না। রোগশীর্ণ তুর্ব্বল দেহটিকে কোনক্রমে টানিয়া টলিতে টলিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

শরতের এক রবিকরোজ্জ্বল প্রভাত।—

মাকে ঘিরিয়া ডলি ও রেখা বসিয়া আছে।

হঠাৎ ডলি বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ মা, আজ কত দিন হ'ল মাষ্টার মশাই এলেন না। বাড়ীতে গিয়েও ত' তাঁর দেখা পেলেম না—কোনো খবরও তিনি দিলেন না—মায়ের বুক ব্যথায় টনটন করিয়া উঠিল। এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন।

এই নিঃসম্বল মায়াবী সন্তানটি এমনভাবে তাঁহাকে জড়াইয়াছে যাহার বাঁধন ছেঁড়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অনেক দিন তিনি ভাবিয়াছেন, কেন এই অপরিচিত পথের ছেলের জন্য তাঁহার মন কাঁদিয়া ওঠে? কেন তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন না? সমাধান তিনি কিছু খুঁজিয়া পান নাই। সেদিন যখন প্রথম নীহারকে তিনি আঘাত দিয়াছিলেন এবং সেই নীহার যখন নিঃশব্দে শুধু তাঁহার মুখের পানে একটিবার মাত্র চাহিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেদিনও অসহ্য বেদনায় বুক তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এত স্নেহ করিবার কি আছে? হয়ত কিছুই নাই। তবুও উহার মাঝে ভগবানের দেওয়া যে জিনিসটি আছে, তাহাকে ত' আর অস্বীকার করা যায় না। শক্তি ও জড় তুইটি অভিন্ন আত্মা। একে অপরকে আকর্ষণ করিয়া আছে। এও ঠিক তাই। ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

## নীহারের মা

সেদিনকার কথা স্মরণ করিয়া মায়ের চোখে জল আসিয়া পড়িল। নীহারকে আঘাত দেওয়া তাঁহার ঠিক হয় নাই। সে যে সন্তান—চির-দিন পরমুখাপেক্ষী। হয়ত সেই জন্যই সে চলিয়া গিয়াছে। অনুশোচনার তীব্র আগুনে মায়ের অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল।

তারপর নীহারের যে কয়খানি চিঠি তিনি পাইয়াছেন তাহাতেও তাহার অন্তরের জ্বালা তিনি অনুভব করিয়াছেন।......অভিমানের বশ-বর্ত্তী হইয়া এই পাগল ছেলেটি সব করিতে পারে। সেজন্য তাহার কথা স্মরণ হইলেই মায়ের মন অজানা বিপদের আশঙ্কায় দীপশিখার মত কাঁপিয়া উঠে!

ডলিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া মা প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে নীহার কিছু বলে গিয়েছিলো তোদের?

ঘাড় নাড়িয়া ডলি বলিল—না ত'। তবে ক'দিন থেকে তিনি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন। কোন কিছুতেই যেন মন বসাতে পার-ছিলেন না। কিসের অভাব যেন তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। বলিতে বলিতে ডলির চোখ দুইটি ভারী হইয়া উঠিল।

ধরিত্রীময়ী নীরবে সব শুনিয়া গেলেন; কিই বা তাহার বলিবার ছিল। তবুও কথার রেশ টানিয়া তিনি বলিলেন—হ্যাঁরে ডলি, তার ঘরে গিয়ে কি দেখ্‌লি বলত'?

বিশেষ কিছু নয় মা। দেখলুম জানলাটা খোলা আছে। বিছানাটা ময়লা,—চট্‌কানো। এমন বিশৃঙ্খল মা কি বল্‌ব! পাশের ঘরে জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন তাঁরা কিছুই জানেন না। খালি ক'দিন আগে কেমন যেন মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে কোথায় বেরিয়ে গেলো—এই টুকুই তাঁরা জানেন।

ধরিত্রীময়ীর অন্তরে এই রকম একটা আশঙ্কাই জাগিতেছিল। বোধহয় নীহার একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে।

খানিকটা থামিয়া ধরিত্রীময়ী আবার বলিলেন—হ্যাঁরে কোথায় গিয়েছে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি ?

হ্যাঁ মা। কিন্তু কেউ তাঁরা কিছু বলতে পারলেন না। কেবল ওই কথাই বললেন।

ধরিত্রীময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। হয়ত' তাঁহার দোষেই এমনটা সম্ভব হইয়াছে।

রেখা মায়ের আরো কাছে সরিয়া আসিল,—

—হ্যাঁ মা, তুমি কাঁদছ ?

ধরিত্রীময়ী জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে নানান চিন্তা তাহার মাথায় আসিয়া জড়ো হয়। ধরিত্রীময়ীরও আজ ঠিক তাহাই হইয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আজ নীহারের কথাই তাঁহার বার বার করিয়া মনে পড়িতেছে। নীহার যেন তাঁহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন থাকিয়া থাকিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের যে স্নেহরসটুকু তাহার জন্য জমা হইয়া আছে, তাহা আজ সমুদ্রের মত উত্তাল হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চায় !

—মা, মা গো !

ধরিত্রীময়ী শিহরিয়া উঠিলেন—নীহার ! নীহার ! ওরে ডলি এ, যে তোদের মাষ্টার মশায়ের গলা !

ডলি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া গিয়া নীহারকে জড়াইয়া ধরিল। —মাষ্টার মশাই ! কোথায় ছিলেন মাষ্টার মশাই এতদিন ? ধরিত্রীময়ী

একেবারে নীহারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন—একি চেহারা হয়েছে বাবা? শরীরে যে আর কিছু নেই—নীহার মায়ের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ডাকিল—মা!

ধরিত্রীময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নীহারের চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া সে বলিল—মা, আজ আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি, বলুন, আমায় ফিরিয়ে দেবেন না।

ধরিত্রীময়ী কি বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কথা তাঁহার বাধিয়া গেল। সমস্ত দেহ তাঁহার আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। হায় রে! ভিক্ষা তিনি দিবেন কেমন করিয়া। তিনি নিজে যে ভিক্ষুক, ভিক্ষা দিবার সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? মাকে নীরব দেখিয়া নীহার আবার বলিল—আজ আমার মহা উৎসবের দিন মা। আজ আমি আমার মনের মন্দিরে মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করব। আপনি চলুন মা আমার সঙ্গে,—এই আমার ভিক্ষা।

ধরিত্রীময়ী নিরুত্তর রহিলেন।

রেখা বলিয়া উঠিল—দিদিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চলে যাও না মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে।

অসহিষ্ণু হইয়া নীহার বলিল—আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে মা। আমি বড় দুর্ব্বল—

ধরিত্রীময়ী একবার এই রোগদুর্ব্বল বৈরাগী ছেলেটির প্রতি চাহিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—চলো বাবা। ডলি মায়ের হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

গাড়ীতে উঠিয়া মা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা তোমার অমন শরীর হ'ল কেমন করে ?

নীহার হাসিয়া বলিল—বিশেষ কিছু নয় মা। সামান্য একটু অসুখে পড়েছিলাম—

ক্ষুণ্ণ হইয়া মা বলিলেন—একটা খবর দিলেই তো পারতে বাবা।

নীহার ম্লান হাসিল। সে হাসির অর্থ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অতি স্পষ্ট। তাহাতে যেন ব্যঙ্গ নিহিত আছে।

মা চুপ করিয়া রহিলেন। খানিকপরে বলিলেন—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা বল্‌লে না তো ?

হাসিয়া নীহার বলিল—সে ত' আমি বলে বোঝাতে পারব না মা।

মা আর কোন কথা বলিলেন না।

গাড়ী আসিয়া থামিল একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে—জ্যোৎস্না ছুটিয়া আসিল। পরণে তাহার লাল পাড় তসরের শাড়ী। মাথায় একরাশ ভিজা কাল চুল পিঠের উপর বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—চোখে মুখে তাহার কৌতুকের আভাস।

মাকে প্রণাম করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার নাম কি মা ?

জ্যোৎস্না হাসিয়া বলিল—সে কথা এখন থাক মা। আগে আপনি ভেতরে চলুন।

মা ডলির হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন।

মা বিস্মিত হইয়াছেন। নীহার তাঁহাকে কোথায় লইয়া আসিল ? এই মেয়েটিই বা কে ? ভাবিয়া তিনি কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

জ্যোৎস্না বলিল—চলুন মা ঘরে বসাই আপনাকে।

সংক্ষেপে ধরিত্রীময়ী কহিলেন—চলো মা।

* * * *

মা চলিয়া গেলে রেখা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একলা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। এদিক সেদিক সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই সে মন বসাইতে পারিল না। এইরকম অলসভাবে নড়িয়া চড়িয়া সারাটাদিন তাহার কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় অনিলবাবু আসিলেন।

বাড়ী ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাঁহার ছোট বোন কল্যাণী আসিয়া কহিল—হ্যাঁ ছোড়দা বৌদি কোথায় গেছে? একটু বিস্মিত হইয়া অনিলবাবু বলিলেন—কেন? কোথায় আবার যাবে! কল্যাণী যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—ওমা, তাও জাননা বুঝি! সে যে তোমার সাধের মাষ্টারের সঙ্গে চলে গেল।……আচ্ছা ছোড়দা মাষ্টার বাইরের লোক, তার সঙ্গে এতো কিসের টান বলতো শুনি?

অনিলবাবু ক্ষেপিয়া উঠিলেন—সত্যি সে গেছে নীহারের সঙ্গে? কল্যাণী মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমি শ্বশুর বাড়ী হতে এসে দেখি ছোট বৌ নেই। বড় বৌয়ের মুখে শুনলুম সে চলে গেছে। সঙ্গে করে আবার ডলিকে ও ছায়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহা ঢং দেখে আর বাঁচি না! জানি আমি, ও কখনও ভালমানুষের মেয়ে নয়—এতদিন কিছু করতে পারে নি, সে শুধু তোমার দাপটে। নইলে এতদিন কবে—

তীব্রস্বরে রেখা বলিল—চুপ করো পিসিমা—

রেখা এতক্ষণ সবই সহ্য করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কল্যাণী যখন

যা তা বলিতে সুরু করিল, তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। বয়স তাহার অল্প হইলেও বুঝিবার শক্তি তাহার অনেক।

হঠাৎ বাধা পাইয়া কল্যাণী একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল—তুই চুপ করে থাক রেখা। একরত্তি মেয়ে পাকা পাকা কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। তুই এসবের কি বুঝিস্ বলত' ?

রেখা ততোধিক ঝাঁঝাল স্বরে বলিল—আমি সব বুঝি। তুমি কি বোঝ বলত। তুমি বোঝ খালি পরের সর্ব্বনাশ কেমন করে করতে হয়। ছি ছি ছি, মুখে তোমার এতটুকু বাধল না এ কথা বল্‌তে—

কল্যাণী প্রথমটা ভয়ানক অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তারপর সে তাহার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বিনাইয়া বিনাইয়া সে সুরু করিল—আমি বল্লেই যত দোষ। এদিকে লোক যে কত কথাই বল্‌তে সুরু করেছে তার বেলা বুঝি দোষ নেই! অতটুকু মেয়ে তুই এসবের কি বুঝবি! না, এর একটা বিহিত কর ছোড়দা।

রেখা উত্তেজিত স্বরে বলিল—লোকে বলে? লোকে বলে কী? কে বলেছে বল না।

কল্যাণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ সাপের মত গর্জ্জাইতে লাগিল।

অনিলবাবু রেখাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—চুপ কর বলছি। পাজি মেয়ে কোথাকার। বুড়োমি করবি তো মুখ ছিঁড়ে দেব। তারপর খানিকটা থামিয়া তিনি আবার বলিলেন—যা জিজ্ঞেস করব সত্যি বলবি। মিথ্যে কথা বল্‌লে তোকে আর আস্ত রাখব না।

# নীহারের মা

রেখা ধীরভাবে কহিল—মিছে কথা আমি বলি না। বলুন আমাকে কি বলতে হবে। হঁ্যা ভুলে গিয়েছিলাম একটা কথা। মা আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।

রেখা চিঠিখানি তাহার পিতার হাতে দিল।

অনিলবাবু ধরিত্রীময়ীর চিঠিখানি আদ্যন্ত পড়িয়া কহিলেন—কখন তোর মা গেছে ?

রেখা বলিল—এই তিন চারটের সময়।

—কখন আসবে বলে গেচে ?

এখুনি আসবার কথা। মাষ্টার মশাই নিজে এসে রেখে যাবেন বলেছেন।

অনিলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। ধরিত্রীময়ীর চিঠিটা পড়িয়া তাঁহার মন খানিকটা শান্ত হইয়াছে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন নীহারের সঙ্গে গিয়াছে, ইহাতে এমন কী-ই বা দোষ হইতে পারে ? নীহারও তাঁহাকে বিবেচনা করিয়াই লইয়া গিয়াছে। এর জন্য আবার আমার মতের কি প্রয়োজন ?

কল্যাণীর কথায় তাঁহার মনে এক আকস্মিক জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি সহসা অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন ধীরভাবে চিন্তা করিয়া সে কথাটা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

এমন সময় কল্পনাথ আসিয়া খবর দিল—মাষ্টারবাবুর কাছ হইতে লোক আসিয়াছে রেখা দিদিমণিকে লইয়া যাইবার জন্য, নীচে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

কল্পনাথ একখানি চিঠি অনিলবাবুর হাতে দিল। তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিলেন।—

# নীহারের মা

নীহার লিখিয়াছে—

স্নেহের রেখা,

তোমাদের দৌলতে মাকে পেয়েছি ভাই। আমার এতদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হয়েছে। তাই আনন্দ রাখবার আজ আর জায়গা পাচ্ছিনা। তুমি যদি দিদি, এ আনন্দে যোগ দিতে তবে বুঝতে এ কেমন! তুমি রাগ কোরো না ভাই। মাকে আজ আর পাচ্ছ না। আজকের জন্য তিনি আমার নিজস্ব—আমার মন্দির আজ তিনি আলো করে থাকবেন। এটুকু তোমাদের কাছ হতে ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি। তোমার জন্য গাড়ী পাঠালাম দিদি। তুমি আসবে। হ্যাঁ, পারতো বাবাকেও সঙ্গে এনো। ভুল হয় না যেন। আমার আশীষ জেনো। ইতি—

তোমার দাদা
নীহার

অনিলবাবুর সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল। তিনি রেখাকে ডাকিলেন—

এদিকে কল্যাণীর সহিত রেখার বিবাদটা বেশ ভাল ভাবেই পাকিয়া উঠিয়াছে। কল্যাণীও ছাড়িবার পাত্রী নয়।

তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ কথাগুলি বেশ গুছাইয়া শব্দভেদী বানের মত সে রেখার দিকে ছাড়িতেছে, রেখাও যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে সেগুলিকে ফিরাইয়া দিতেছে। ক্রমশঃ সে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল এই সব অশিক্ষিত মেয়েমানুষগুলি যদি পৃথিবী হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কলঙ্কের ভার যেন অনেকটা কমিয়া যাইবে। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাহার সারা অন্তরে জ্বালা ধরিয়া গেল। সে সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না। ছুটিয়া বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

## নীহারের মা

তাহাকে দেখিয়াই অনিলবাবু বলিলেন—ওরে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নে। বেরুতে হবে এখুনি—

পাঁচ মিনিটের ভিতর রেখা তৈয়ারী হইয়া আসিল। তাহার হাত ধরিয়া অনিলবাবু গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

কল্যাণী একবার বাঁকা চোখে চাহিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

মাকে পাইয়া নীহার পাগল হইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার এতবড় আনন্দের দিন আর কখনও আসে নাই। আজ তাহার সমস্ত আনন্দ বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মত প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। তাহার মনে হয় পৃথিবীতে দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। আজকের প্রভাতে সুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অ-সুন্দর লজ্জায় আত্মগোপন করিয়াছে। পৃথিবীর প্রতি পরমাণুটিকে পর্য্যন্ত যেন আজ ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। নীহার হাসিয়া ওঠে। দুঃখ সে অনেক পাইয়াছে। একদিন উন্মুক্ত নীলাকাশে চঞ্চল পাখীর দলকে দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছিল, তাহাদের জীবনের সহিত নিজের জীবনের যোগসূত্র খুঁজিতে গিয়া সে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। আর আজ! আজ তাহার অন্তরের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের নিকট উহাদের অসীম প্রাণধারার চাঞ্চল্য ম্লান হইয়া যায়! আজ সে অপরাজেয়! কোন কলঙ্ক, কোন মলিনতা আজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়ের স্নেহ ভালবাসার প্রবল আলোর বন্যায় আজ তাহারা ভাসিয়া যাইবে! .....

মানুষ যেদিন তাহার অন্তরের স্বাভাবিকতাকে হারাইয়াছে, সেই-দিনই সে মরিয়াছে। সভ্যতা তাহাকে মানুষের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে নাই, তাহাকে মনুষ্যত্বের তলায় নামাইয়া দিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগের মানুষ আজ আমাদের নিকট বর্ব্বর, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন;

আর আজ যে প্রতারণায়, স্বধর্ম্মে, সন্দেহে সন্দেহে মানুষের মনকে বিষাইয়া তুলিয়াছে,—সেই শ্রেষ্ঠ!

নীহারের হাসি পাইল। এত বড় ভুলও মানুষের হয়!

এতদিন একটা কৃত্রিমতার বাঁধনে সে বন্দী হইয়াছিল, আর আজ সে অকৃত্রিম,—খাঁটি!

নীহারের চমক ভাঙ্গিল। অনিলবাবু আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া গেল।

এই ঘটনার পর কত মাস কাটিয়া গিয়াছে। মা নীহারকে বলি বলি করিয়াও বলিতে পারেন নাই। নীহার ইহার পর হইতে নিয়মিত ভাবে পড়াইতে আসে; মাও তাহার এই স্নেহের ছেলেটিকে চোখের আড়াল হইতে দেন না। নীহারেরও মা ছাড়া মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কোন কাজে মন থাকে না, জীবনের সবটাই বুঝি এইরূপ ব্যর্থতার মাঝেই শেষ হইয়া যাইবে! সারাদিন মায়ের কথা, মায়ের চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। মাকে লইয়া সে সারাদিন কল্পনার সৌধ গড়িয়া তোলে; কিন্তু সন্ধ্যায় মায়ের সম্মুখে যাইয়া বলিবার মত ভাষা সে খুঁজিয়া পায় না। মাকে চোখের সামনে পাইয়া ভাবে আর আমার চাহিবার বা পাইবার কি থাকিতে পারে, চাওয়া বা পাওয়ার ত' ইহাই চরম!

অনিলবাবুও তাহার পর হইতে নীহারকে বিশেষ কিছু বলিতেন না, বা তাহার কোনরূপ কাজে বাধা দিতেন না। সেদিন নীহারের যে অতুলনীয় মাতৃভক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাতে নিজের প্রতি লজ্জার তাহার সীমা ছিল না। নীহারের মাতৃভক্তি যে এতখানি গভীর ও আন্তরিক হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাই সেদিনের

জন্য শাস্তি দিতে যে চাবুক লইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন, অবাক হইয়া তাহাই দেখিয়াছিলেন যে কখন নিজের অজ্ঞাতে ফুলের মালায় পরিণত হইয়াছে ! নীহারকে তাহা দিয়াই সেদিন আনমনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়রে মানুষের মন !

সেদিন শনিবার। রেখাদের বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রী লইয়া একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উৎসবের লক্ষ্য ছিল "জাতিভেদ সংস্কার ও প্রগতি।' সেই সভায় সমাজের বড় বড় কর্ণধার ও সমাজপতিদের আহুত করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল আজ বেশ একটা বড় রকমের পরামর্শ করা যাইবে, যাহাতে এই জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায় এবং যাহাতে প্রস্তাবটি সমাজপতিদের দ্বারা অনুমোদিত হয় তাহারই চেষ্টা করা হইতেছিল। সভার প্রধান উদ্যোগী ছিল ডলি ও রেখা। ইহাদের পরিশ্রম ও কার্য্যকারিতায় প্রত্যেক নারী বিদ্যালয়ে এইরূপ সভা হইবে এবং ইহা লইয়া বাড়ীর লোক ও পুরোমহিলাদিগকে যাহাতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলা যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

সভার কাজ আরম্ভ হইলে ডলি "সমাজ ও স্ত্রীজাতি" সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলিতেছিল :—

সংসারে মানুষ প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্যতাকে অস্বীকার করিতে পারে না। নারী সেই প্রকৃতি। অথচ এই পুরুষত্বের অসত্যদাবী নারীকে আবহমান হইতে বহন করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। নারীর শক্তির কাছে পুরুষের শক্তি কতটুকু ? অত্যন্ত তুচ্ছ ! পুরুষত্বের অধিকারে নারী আজ তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে চলা ফেরা করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের নিজস্ব সমাজ নাই, শক্তি নাই, কোন কার্য্যকরী ইচ্ছা নাই, ইহার প্রতিরোধী কে ? পুরুষ ! অবলা বলিয়া তাহাদের আখ্যা দিয়া

তাহাদের বাহির হইবার সমস্ত দ্বার তাহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দেবী বলিয়া, শক্তিরূপিনী ইত্যাদি কত কি মিথ্যা স্তোক বাক্যে—ভুলাইবার তাহাদের চেষ্টার শেষ নাই। সত্যই যদি আমাদের কোন শক্তি থাকে, আমাদের সে মূল্য কে দিয়াছে? যুগে যুগে যে অসহ্য নির্য্যাতন নারীজাতির উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান যুগেও কি তাহারই পুনরাভিনয় হইবে! বিশ্বের বুকে আমাদের পরিচয় আছে আমরা মায়ের জাত, প্রকৃতির সেটুকু মহত্ত্বের পরিচয়। তাই শুধু বিশ্বকে বাধ্য হইয়া এই দিকে নারীকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। তাই আজ পৃথিবীর মাঝে নারীর স্থান,—মায়ের স্থান। অথচ এই মাতৃজাতির অপমানের ও লাঞ্ছনার সীমা নাই।......

সভার শেষে ডলি ও রেখা ভাবিতেছিল—কোন্ জিনিষ তাহাদের পিছনে অভয় দিতেছে? এত কাজের মধ্যেও তাহারা ভুলে নাই তাহা। তাই মনে মনে তাহারা সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষটিকে প্রণাম না জানাইয়া পারিল না। চিরদিনের আশা ও আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া তাহারা দুইটি বোন যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সাফল্যের পথে চলিয়াছে তাহার পেছনে কে আছে? সে নীহার! যে জয়টীকা আজ তাহাদের ললাটে অপূর্ব্ব শোভায় দীপ্তি পাইতেছে, তাহার পিছনে আছে কাহার মঙ্গলহস্তের অভয়,—সেও নীহার ছাড়া অন্য কেহ নয়। সমাজের এই মজ্জাগতধারা বদ্‌লাইয়া যে তীব্র কশাঘাত দিয়াছে ও প্রাণে নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়া দিয়াছে, সে কে? সেত নীহার।

রেখা ও ডলি যখন স্কুল হইতে ফিরিল, তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে।

আগামী কাল রবিবার জানিয়া সেদিন আর লেখা পড়া না করিয়া

তাহারা বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। দুইজনে মিলিয়া আজিকার সভা লইয়া অনেক আলোচনা করিতে লাগিল।

শীতের শেষ তখন। অনিলবাবু আজকাল ফিরিতে তাই বেশী রাত্রি করেন না। সেদিন বিকালে ডলি ও রেখাকে স্কুল হইতে ফিরিতে না দেখিয়া তাড়াতাড়িই আজ তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পিতাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দুই বোনে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ভিতরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল। বাধা দিয়া অনিলবাবু কহিলেন—হ্যাঁরে ডল্, আজ তো শনিবার! তোদের ফিরতে যে তবে এত দেরী হল? কৈফিয়তের দাবীতে তাহার ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ডলি উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে—দেখিয়া রেখাই জবাব দিল—স্কুলে একটা মিটিং ছিল, বাবা।

একটু গম্ভীর স্বরে অনিলবাবু প্রশ্ন করিলেন—স্কুলের সভা না নীহারের সমাজ সংস্কারের সভা, কোনটা শুনি?

কেহ জবাব দিল না। দুইজনেরই মাথা কেমন আপনা হইতেই সামান্য নত হইয়া গেল।

আচ্ছা শোন্; আর হ্যাঁ, তোদের জন্যে একজন মাষ্টার ঠিক্ করেছি, ওই ওদিককার বৈঠকখানায় বসে আছে। গরীব; কিন্তু খুব শিক্ষিত, আজ থেকে উনিই তোদের পড়াবেন।

এতটা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। উভয়েই অবাক হইয়া কহিল—

আর আমাদের মাষ্টার মশাই!

—তাকে আমি অন্য কাজে দেব। তোদের আর পড়াতে হবে না।

ওসব সমাজ সংস্কার-টংস্কার করা চলবে না। বুড়ো মেয়েরা, ধিঙ্গীপনা করতে লজ্জা করে না! সামান্য ইস্কুলে সমিতি করে সমাজ পাল্টাচ্ছেন! সরোষে তিনি ভিতরের দিকে পা বাড়াইলেন—আমি একদম ভালবাসিনা ও সব, আর কোনদিন যেন কিছু শুনতে না পাই।

কি বলিবার জন্য ডলি চেষ্টা করিল। ঠোঁট দুটি সামান্য কাঁপিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া সে আর উচ্চারণ করিল না। রাত্রে খাইতে বসিয়া অনিলবাবু ধরিত্রীময়ীকে বলিলেন—ওদের জন্যে নতুন মাষ্টার ঠিক্ করলুম।

কথাটা হঠাৎ ধরিত্রীময়ী বুঝিতে পারিলেন না। তাই প্রশ্ন করিলেন—কাদের জন্যে, মেয়েদের?

—হ্যাঁ।—

অবাক হইয়া ধরিত্রীময়ী কহিলেন কেন, নীহার আর পড়াবে না?

—না। অনিলবাবুর স্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ধরিত্রীময়ী যেন বিশ্বাস করিতেই পারিতেছিলেন না যে হঠাৎ তাঁহাকে এমন এক দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। অনিলবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তাই। মেয়েদের যে ধরণের শিক্ষা হচ্ছে, তা আমি একদম পছন্দ করি না আর ওদের ওতে উন্নতি হবে কোন কালে আমি তা বিশ্বাস করি না।

মা একথার জবাব দিলেন না, দেবার মত কিছু নাইও। একটুপরে ধীরে ধীরে বলিলেন—আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই, কেমন করে এখনও তুমি তাকে এতটা অবিশ্বাস কর।

অনিলবাবু উত্তর দিলেন—তোমার চোখ থাকলে তুমিও করতে। মা ম্লান হাসিলেন, বলিলেন—ভগবান বাঁচিয়েছেন আমাকে তাহ'লে।

## নীহারের মা

কঠিন হইয়া অনিলবাবু বলিলেন—তামাসার কথা নয় ধরিত্রী, কোনপথে মেয়েরা চলেছে, তা বোঝ্‌বার মত ক্ষমতা আমার হয়েছে আমি বিশ্বাস করি, মেয়েরা যে কেন ওর এত বাধ্য তাও বুঝি; এর পরেও ওকে রাখ্‌লে সমাজের দিক্‌ থেকে গোলমাল হতে পারে! আশ্চর্য্য, তোমার এতখানি বয়স হ'ল, অথচ এ সামান্য জিনিষটুকু চোখে পড়লো না তোমার? ধরিত্রীময়ী এই ইঙ্গিতে শিহরিয়া উঠিলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন কি বল্‌ছ তুমি। নীহারের সম্বন্ধে ও সব কথা উচ্চারণ করলে ভগবানের কাছেও অপরাধী হতে হবে। তারপর আকুল হইয়া কহিলেন, সে যে আমার খুব ভাল ছেলে গো। এ সব বিশ্রী ধারণা তোমার কেমন করে হ'ল?

অনিলবাবুর খাওয়া শেষ হইয়াছিল, উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন ব্যবসা করে মাথার চুল পাকালুম, আর এই সামান্য কথাটা বুঝ্‌তে দেরী হবে আমার?

ধরিত্রীময়ীর বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল। অভিমানে ও স্বামীর উপর রাগে তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

রেখা ও ডলির জন্য নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেল। এদিকে নীহার পূর্ব্বের মতই আসা যাওয়া করে। তবে মাঝে একদিন কে যেন বলিয়াছিল তাহাকে ঐ ধরণের একটা কথা, ছাত্রীদের লইয়া সে সমাজ না কি বিষয়ে আলোচনা করে বলিয়া তাহাকে আর শিক্ষকতা করিতে হইবে না। কিন্তু শুনিলেও সে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়াও এতটুকু বিচলিত হয় নাই। ব্যাপারটা সে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। মায়ের সহিত তাহার পরিচয় আজকের নয়। মাকে সে ভালরূপেই চিনিত। তিনি কখনও এমন কাজ করিতে

পারেন না। কেমন করিয়া তিনি নীহারের কথা ভুলিয়া যাইবেন। কেমন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবেন! যে মায়ের স্নেহ কঠিন বর্ম্মের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকিয়া তাহাকে সকল আঘাত হইতে রক্ষা করিতেছে সেই মা কি জানেনা যে তিনি নীহারের কতখানি! তিনি প্রতারণা করিলে নীহার বাঁচিবে কি লইয়া, ইহা কি তিনি জানেন না। তাই সে বিশ্বাস করে নাই সে কথায়। তাহা ছাড়াও তাহার হাতে গড়া, শৈশব হইতে মানুষ করা ছাত্রীদুটি, যাহাদের সে বোনের চেয়ে ভালবাসিয়াছে, তাহারাই বা তাহাকে ভুলিবে কেমন করিয়া। তাই সে ওদিকে প্রায় মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। তবুও যেন কোথায় কাঁটার মত এক অশ্বস্তি থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল তাহাকে।

সেদিন সকালে এই সব ভাবিয়া মনটা কেমন অস্বচ্ছন্দ হইয়া গেল। পড়াইতে আর ভাল লাগিল না। ডলি ও রেখাকে ডাকিয়া বলিল—শোন?

—কি মাষ্টার মশাই? উভয়ে মুখ তুলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীহার বলিল—আজ আর পড়াব না তোমাদের, শরীরটা ভাল নেই। অঙ্ক আর লেখা দিয়ে যাচ্ছি, করে রেখো এ-গুলো। কাল্ যদি না আস্‌তে পারি, একেবারে পরশু সকালে দেখ্‌ব, কেমন?

উভয়ে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এমন কতদিনই হয়—নীহার দুই বেলাই পড়াইতে আসে নাই। ইহাতে অস্বাভাবিক নাই কিছু! নীহার বাহির হইয়া গেল।

সকাল পার হইয়া দুপুর আসিল। ডলিদের স্কুলবাড়ী সারানো হইতেছে বলিয়া স্কুল কয়দিন বন্ধ আছে। উভয়ে দুপুর বেলা বসিয়া

## নীহারের মা

মাষ্টার মশায়ের দেওয়া কাজগুলি সারিতেছিল। হঠাৎ মা আসিলেন। কহিলেন—হ্যাঁরে, তোরা ছুটিতে কি করছিস্‌রে—এখানে?

রেখা কহিল—মাষ্টার মশাই টাস্ক দিয়ে গেছেন মা, তাই সেরে রাখ্‌ছি।

মা শুধু বলিলেন—ওঃ! বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিলেন—ওরে, তোদের নতুন মাষ্টার এসে বসে আছে বাইরে। উনি যে আর নীহারকে রাখ্‌বেন না বল্‌ছিলেন। ছেলেটি নাকি ভারী বিদ্বান্‌।

নীহারের নিন্দা রেখার সহ্য হয় না। বাধা দিয়া সে কহিল—ইস্‌, তা আর হতে হয় না, মাষ্টার মশায়ের চেয়ে বিদ্বান্‌! মা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—তাই ত' শুন্‌লাম ওঁর কাছে।

রেখা কহিল—হোক গে বিদ্বান্‌ মা! যার তার কাছে আমরা পড়্‌তে পারব না। এতদিনের মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়ে আবার নতুন কারুর কাছে পড়তে পারব না আমরা। আচ্ছা, মাষ্টার মশায়কে ছেড়ে দিতে তোমার কষ্ট হবে না মা? তিনিই বা যাবেন কি করে। তাঁরই কি কম কষ্ট হবে মনে করছ।

বাহিরের দিকে চাহিয়া মার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কোন ক্রমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন—তা কি আর হবে না রে! মানুষের মন ত', খানিকটা কষ্ট হবে বৈ কি? তারপর আবার আস্তে আস্তে ভুলে যাবো। মানুষকে ভালবাস্‌তেও যতক্ষণ লাগে, ভুল্‌তেও তার বেশী সময় লাগে না। নিজেকে আর তিনি যেন সাম্‌লাইতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুকে চাপিয়া জান্‌লার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। পরে কথা বলিবার মত সংযম সংগ্রহ করিয়া

কহিলেন—উনি যখন বলেছেন তখন ওঁর কথা অমান্য করা উচিত হবে না ডলু? আর ছেলেটিও ভাল বোধ হয়, আমাকে মা বলে ডাক্‌ল। পড়েই দেখ্‌না দু'দিন?

মায়ের মুখের পানে চাহিয়া ডলি বা রেখা প্রতিবাদ করিবার সাহস পাইল না। তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল—সেই ভাল মা! মাষ্টার মশাই যে ক'দিন না আসেন পড়েই দেখি আমরা?

মা কল্পনাথকে দিয়া অমলকে ভিতরে ডাকাইলেন। তারপর কহি-লেন—আমার এই মেয়ে দুটি তোমার ছাত্রী, বাবা। বোনের মত ভেবে, যত্ন নিয়ে পড়িও এদের, কেমন? তিনি আর দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না, ঐ কথা ক'টি বলিয়াই ভিতরে গেলেন। দুই চোখে তাঁর শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ যেন স্তর বাঁধিয়া উঠিতেছিল। পাছে অমলের সম্মুখে এই আকস্মিক স্নেহান্ধ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায়, তাই তাহার বিস্মিত চোখের সম্মুখেই কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে তিনি প্রায় ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তাহার অন্তরের জমাট ব্যথা আর কোন সংযমই মানিল না। আকুল হইয়া তিনি ছোট মেয়ের মত বারান্দায় ঠেস্ দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কত কথাই আজ মনে পড়িতে লাগিল তাঁহার! কতদিন নীহারের সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন। মাঝে মাঝে পরের ছেলে ভাবিয়া তাহার মায়া কাটাইবার চেষ্টাও করিয়া-ছেন। আজ সন্ধ্যার এই ঘনায়মান অন্ধকারে একান্ত ভাবে নীহারের কথা স্মরণ করিয়া বারে বারে শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল, জগতের উপেক্ষিত যে ছেলেটি তাঁহাকে পূর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেখান হইতে তিনি কোন প্রকারেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন না, এমন কি চেষ্টা করিয়া তাহার কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। এ কি

## নীহারের মা

অভিনয়, না পরীক্ষা। ছেলেটিকে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব—তাহার মাতৃভক্তির তল কোথায়? কিন্তু সত্য তাহা নহে। যে আজ তাহার প্রাণের সবটুকু দিয়া একান্ত ভাবে তাঁহাকেই প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এ ত' পরীক্ষা নয়, এ যে প্রতারণা! সে যখন শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে তখনকার জন্য সান্ত্বনা দিবার মত কথাও যে নেই কিছু! এমন দুর্য্যোগময় মুহূর্ত্তে তিনি সম্পূর্ণ রিক্তা!

স্বামীর প্রতি সুতীব্র অভিমানে ধরিত্রীময়ীর সমস্ত অন্তর পুরিয়া উঠিল। অসহায় শিশুর মত আকুল হইয়া তাঁহার অন্তর মুখর হইয়া ভগবানের পায়ে এই প্রার্থনাই জানাইতে লাগিল—তুমি তাকে দেখো ঠাকুর! তুমি তো জানো, সে আমার বড় অভিমানী! তুমি ত' জানো আমি কত অসহায়! আমার সাধ্য দিয়ে আমি তার বুকের ক্ষত ধুয়ে দিতে পারি; কিন্তু তার যে আর কেউ নেই! আমার সমস্ত অমঙ্গল এনে তুমি তার মুখের পানে চাইতে এতটুকু কার্পণ্য কোরো না, তোমার পায়ে এইটুকু জানানো রইল।—

মায়ের কণ্ঠে ভাষা নাই। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। নীচের তলায় কোথায় কি হইতেছে, এতক্ষণ তাঁহার খেয়ালই হয় নাই। কোথায় ঢং ঢং করিয়া পেটা ঘড়িতে ৯টা বাজিয়া গেল। মায়ের চোখের জল তখনও শুকায় নাই; পূর্ব্ব আকাশের জলজ্বলে শুকতারার মত তাঁহার চোখের তারার নীচে মুক্তার দীপ্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। মায়ের অন্তর নৈশ আকাশের কোথায় যে কাহার সন্ধানে আকুল হইয়া ফিরিতেছিল, তাহা তিনি নিজেই জানিতে পারেন নাই। শুধু এইটুকুই বুঝিতে পারিলেন ঐ বিশাল আকাশের মত সমস্তই শূন্য হইয়া গিয়াছে, শুধু ঐ সুদূরবর্ত্তী তারকার মত ক্ষীণ দীপ্তি লইয়া ম্লান আশার রশ্মি এখনও দেখা যাইতেছে!

## ১১

অনিলবাবুর বাড়ী হইতে নীহার ঘরে ফিরিল। ঘর বলিতে মেসের বাহিরের দিকের ঘর একখানি। দাদার বাড়ী সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কোন রকমে রাত্রিটুকু কাটাইবার জন্য এই বাসা; বাকী সময়টুকু ত' কাজে কাজে বাহিরে বা মায়ের কাছেই কাটিয়া যায়!

আজ ওখান হইতে ফিরিয়া যেন কিছু ভাল লাগিতেছিল না তাহার। কলিকাতার উপর তাহার যেন বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে। মা না থাকিলে বহু পূর্ব্বেই সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইত। ভিতরে যেন কোথায় একটা তাহার অস্বস্তি ধরিয়াছে। নীহার ভাবিয়া দেখিল বাহিরে দু'চারদিন বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না বোধ হয়!

ভাবিতে ভাবিতে ঠিক হইল সে চন্দননগর যাইবে। সেখানে তাহার এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে। তাহার পালকপিতা তাহাকে মাঝে মাঝে লইয়া যাইতেন সেখানে। সেখানে কয়েকদিন ঘুরিয়া আসিলে মন্দ হয় না, ইহা ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত সেখানে যাওয়াই সে স্থির করিল।

ছোট একটি সুটকেশে গরম জামা ও দু'একখানি কাপড় লইয়া হোটেলে কিছু খাইয়া সে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু মানুষের মনের ধর্ম্মই অন্যরূপ। বাহিরের কোন জিনিষ আড়াল করিতে হইলে সামনের দিকে কোন কিছু দিয়া তাহাকে দৃষ্টির বাহির করিয়া রাখিলেই চলে; কিন্তু মনের বেলায় সে নিয়ম খাটে না। সত্যই যদি কিছু দিয়া আড়াল করিতে চেষ্টা করা যায়, সে আড়াল কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না। নীহার বারে বারে তাই চেষ্টা করিয়াও সফল

হইতে পারিল না ; বুকের রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া ভিতরের সেই অস্বস্তিকর বেদনাগুলি পাক খাইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।—চারিদিকে ষ্টেশনের কত কোলাহল, কত লোকজন! তাহার মাঝেও তার মনে একইরূপ চিন্তা। মন যেন থাকিয়া থাকিয়া কিসের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। পিছনের ফেলিয়া আসা দিনগুলির তুচ্ছ স্মৃতিকণা, যাহার কোনদিন কোনরূপ দাম আছে বলিয়া মনেও করিতে পারে নাই, সেইগুলি আজ যেন বৃহতের আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। সেদিন যাহার কোন দাম ছিল না, আজ তাহা হইয়াছে অমূল্য। তবুও যেন থাকিয়া থাকিয়া মনে হয় কোথায় বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। যাহার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। আজ যেন তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে! যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তাহার দুঃখের রাত্রির প্রভাত হইয়াছিল একদা, সে ক্ষমতা আর নাই সে সোনার কাঠির। আজ আবার যেন সুরু হইল দুঃখ, কেবলই দুঃখ। যে দুঃখ তাহাকে দীন করিয়াছে, দীনতর করিয়া ভিখারী সাজাইযাছে,—এতটুকু স্নেহের প্রার্থী হইয়া আবার কাহার কাছে কাঙালের মত হাত পাতিতে হইবে। মায়ের কথাগুলিই আজ যেন সকলের চেয়ে বেশী স্মরণ হয়।

এই নিঃস্ব পৃথিবীর বুকে সে ছিল একান্ত আপন, কণ্ঠে ছিল দুঃখের গান, পায়ে প্রতি পদে বাজিত পথ চলার আঘাত, বুকে ছিল অভিমানের দুরন্ত সমুদ্র। এমন সময় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, মা,—অপূর্ব্ব শোভা-ময়ী হইয়া। তাঁহার সে কল্যাণ হস্তের স্পর্শে সব দুঃখ দূর হইয়া গেল, স্নেহের পাল উড়াইয়া—অভিমানের সে সাগর তিনি হাত ধরিয়া পার করিলেন।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে। ক্রুদ্ধ

অজগরের মত বিপুল আক্রোশে যেন কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অভিযান সুরু করিয়াছে।

সহরের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া গাড়ীখানি মাঠের মাঝের পথ ধরিল, তখনও নীহারের মন সম্পূর্ণরূপে বাহিরের দৃশ্যকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। হঠাৎ যেন কোন রূঢ় আঘাতে তাহার কোন সুন্দর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। এ স্বপ্ন দুঃখের সন্দেহ নাই; কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে যে অপরূপ অনুভূতি আছে, তাহার বোধকরি তুলনা হয় না! তাই দুঃখের স্মৃতিও কত সুখের।

দুধারের শস্য-শ্যামল প্রান্তরের পর প্রান্তর,—ধান ভরা মাঠের পর সোনালী মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। বাহিরের সে দৃশ্য কত সুন্দর, কত উপভোগ্য। তাও আজ যেন তাহার ভাল লাগিতেছে না! প্রকৃতির সহিত স্বাভাবিক যোগসূত্রটুকুও ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

বাহিরের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও যেন করুণ ভাব, কেমন সজল ছায়া, বিচ্ছেদের স্পর্শে সবকিছু যেন সামান্য দূরে সরিয়া গিয়াছে। নীহার বুঝিতে পারিল এ অভাব তাহার মায়ের। দুরন্ত অভিমান তাহাকে জোর করিয়া মায়ের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা তো সে পারিবে না, এ বিরহ তাহার পক্ষে অসহ্য। দুই চোখে অকস্মাৎ কোথা হইতে একরাশ জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল—ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না, মাকে ছাড়িয়া সে তিলার্দ্ধও বাঁচিতে পারিবে না।

চন্দননগরে পৌছিয়া কোনমতে একরাত্রি কাটাইয়া যতশীঘ্র সম্ভব কলিকাতায় সে আবার ফিরিয়া আসিল। মায়ের বিচ্ছেদ কল্পনা কোন মতে আনিতে পারাও বাস্তব জগতে একান্ত অসম্ভব!

বিকালে ছাত্রী-বাড়ী গিয়াই সম্মুখেই কল্পনাথের সহিত তাহার দেখা

হইয়া গেল। কল্পনাথকে দেখিতে পাইয়া নীহার বলিল—ডলুকে একবার ডেকে দাও ত' কল্পনাথ?

বৈঠকখানায় নীহার চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—সেদিনকার সে কথার মূলে সত্য কতটুকু তাহার প্রমাণ দরকার।

একটু পরে ডলি আসিয়া ঢুকিল। নীহারকে সম্মুখে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে—মাষ্টার মশাই, আপনি! কখন এলেন?—হাসিয়া তাহাকে নীহার বলিল—এখ্খুনি। তোমার আস্‌তে যে দেরী হ'ল? কল্পনাথ বলেনি যে আমি এসেছি?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডলি কহিল—বলেছে।—আমরা যে পড়ছিলাম নতুন মাষ্টার মশায়ের কাছে! তাইত' আস্‌তে দেরী হয়ে গেল।

নতুন মাষ্টার, ওঃ! কে যেন একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র তাহার বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। নিমিষের জন্য তাহার মনে হইল সন্ধ্যার আঁধার যেন তাহার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছে, ঘর, দুয়ার, ডলি, সম্মুখে তাহাব কোন কিছু নাই, সর্ব্বগ্রাসী ওই আঁধারের কবলে সব কিছু বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু রাশীকৃত অন্ধকার ধূমের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত অনুভব করিবার শক্তি নাই!

কয়েক মুহূর্ত্তেই সে ভাব কাটিয়া গেল। সবই আছে। সম্মুখে আছে—প্রচুর আলো, পৃথিবী, ডলি; তাহার নিজেরও বড় কিছুই হয় নাই।—কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যেমন দেখিয়াছে, তেমনই আছে, কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মিথ্যা, মিথ্যা, সব ফাঁকা, সমস্ত জগৎটাই ফাঁকা আর প্রবঞ্চনা দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে সত্য নাই এতটুকু। সমস্তই কি তাহার

মিথ্যা হইয়া গেল! এতদিন ধরিয়া নিজের বুকের অর্ঘ্য দিয়া যাহার সে পূজা করিয়াছে তাহা মিথ্যা! ইহার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু ঘটিল না কেন? জগতে এতবড় মিথ্যার খোলস সে নাই বা দেখিয়া যাইত, কাহার কি ক্ষতি হইত তাহাতে?

না ক্ষতি কাহার কিছু হয় নাই। জগতে তাহার ক্ষতি হইলে তাহা খতাইয়া দেখিবার মত কাহারো সময় বা ইচ্ছা কোনটাই নাই। কেন সে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যায়—সে পৃথিবীর বুকে একান্ত নিঃস্ব, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাহার জন্য সৃষ্টি হয় নাই? এই ত' ঠিক হইয়াছে। অনেক আশা করিয়াছিল সে, তাই আঘাত তাহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়াছে। রুদ্ধ আবেগ তাহার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—এই বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, ইহা তাহার প্রাপ্য!

ডলি ধীরে ধীরে ডাকিল—মাষ্টার মশাই!

চম্‌কিয়া নীহার মুখ ফিরাইল—ওঃ, তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, না?

শান্ত কণ্ঠে ডলি বলিল—সে জন্যে নয় মাষ্টার মশায়।—মাকে ডাক্‌ব একবার!—

—মাকে? নীহার চকিত হইয়া উঠিল।—ওঃ, হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে যেতে হবে বৈ কি? ধীরে ধীরে সে কহিল—ডাকতে হবেনা,—মায়ের সঙ্গে গিয়ে আমিই দেখা করছি।

* * *

মা নীহারের মাথায় ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হাত বুলাইতে ছিলেন—পাগল, পাগল তুই, আস্ত পাগল একটা? দেখি, মুখ তোল্! ইজি-চেয়ারের arm-এর উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া নীহার নিঃশব্দে

ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। রুদ্ধ আবেগে যাহা এতক্ষণ বাহির হইবার পথ পায় নাই, সামান্য ছিদ্র পাইয়া শতধারায় তাহা এখন উচ্ছ্বসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মা আবার বলিলেন,—ছোট ছেলেকে যে ভাবে সান্ত্বনা দেয়—ছিঃ, তুই কিরে? এখনও কাঁদছিস্?

নীহার মুখ তুলিল—চোখের জলের শীর্ণধারা শুকাইয়া দাগ পড়িয়াছে গালে, সে কহিল—তুমি দেখ মানুষের কান্নাটাই—আশ্চর্য্য, কিন্তু যদি জান্‌তে কত দুঃখে পুরুষের চোখে জল আসে তাহ'লে বোধ হয়—এ ছলনা করতে না মা।

মা ম্লান হাসিয়া কহিলেন—আমি আন্দাজ করেছিলুম এমনই একটা কিছু ঘট্‌বে, তবে বিশ্বাস ছিল আমায় না জানিয়ে তুই চট্‌ করে করবিনা কিছু।

বাহিরের নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীহার অল্পই উচ্চারণ করিল—আশ্চর্য্য, একমুহূর্ত্তের ভুলে জীবনের ধারা আমি পাল্‌টে ফেল্‌তে চাইছিলুম। মায়ের দিকে সে চোখ ফিরাইল, দুই চোখে ক্লান্ত হাসি। নীহার বলিতে লাগিল—আমি জানতুম, তুমিও আমাকে ছেড়ে পারবে না থাক্‌তে, তাইত সেই আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে ছুটে এলুম তোমার মুখের কথা শুন্‌তে। আমার জীবনের সমস্ত অকল্যাণ তুমিই যে মুছে দিয়েছ। তুমি কি পার আমাকে আঘাত করতে!

দুই চোখে মায়ের অন্তরের মমতা উছলিয়া উঠিল। নিজের আঁচলে নীহারের চোখ মুছাইয়া কহিলেন—যা, ওদের পড়াশুনোগুলো দেখ্‌ এবার। অমলের সাধ্য কি পড়ায় ওদের? বোকা ছেলে কোথাকার!

## ১২

আরও অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে তাহার পর। ডলি বেশ বড় হইয়াছে, রেখাও আর খুব ছোটখাটটি নাই। নীহারের শিক্ষার গুণে সভ্যতা, নম্রতা, ইত্যাদিতে, যে সমস্ত গুণ থাকিলে নারী সংসারকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে, তাহাতে সাধারণ মেয়েদের চাইতে তাহারা অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ঘরে ঘরে এমন করিয়া মেয়েরা শিক্ষা পাইলে বাঙ্‌লা দেশে সত্যিই সোনা ফলিবে।

জাতিভেদ নীতি বহুল পরিমাণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পণপ্রথার সে তীব্রতা নাই। নীহারের সাধনাকে তাহারা অনেকাংশে সফল করিতে সক্ষম হইয়াছে।

রেখা ও ডলিকে আর স্কুলে যাইতে হয় না। বাড়ীতে থাকিয়াই নীহারের কাছে তাহারা পড়াশুনা করে। মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার একটা বয়স আছে। তাহার পর আছে সাংসারিক শিক্ষার। সংসারে বাস করিবার এবং সংসারে বাস করিয়া তাহাকে কেমন করিয়া সুন্দরতর করিয়া তুলিতে হয়, নীহার এখন সেই ভাবে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করে। মানুষের চরিত্রকে করিতে হয় মধুর। মানুষের প্রতি অকারণে বিশ্রী আচরণ করিতে নাই। চিরকাল সুখের কোলে পালিত হইলেই দুঃখীর সমবেদনায় দিনান্তে একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে হয়, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া দুঃখীর ব্যথার অশ্রু মুছাইতে হয়, আর্ত্তের দুঃখ নিজের বুক দিয়া অনুভব করিতে হয়, নহিলে সংসারে সকলেই মানুষ হইতে পারিত, কেহ অমানুষ থাকিত না।

# নীহারের মা

সৎশিক্ষা ও সদ্‌গুণ লাভ করিয়া দুইটি বোন যেন দিন দিন নির্ম্মল ও পবিত্র পদ্মের মত বিকাশ লাভ করিতেছিল। কয়েকদিন ধরিয়া মা একটা কথা ভাবিতেছিলেন। বলিতে ইচ্ছা করিলেও নীহারের কাছে উত্থাপন করিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, কিছুতেই তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ এই একটি মাত্র দিক ব্যতীত ছেলেটিকে বাঁধিয়া রাখিবার মত কোন পথই নাই। জ্যোৎস্নার কথাও তিনি যে না ভাবিয়াছেন তাহা নহে। আশ্চর্য্য, তাহার কথা ভাবিলেই তাহার প্রতি মায়ের সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়া ওঠে! তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন—আজ নিশ্চয়ই বলিবেন নীহারকে। নিজের মুখকে বন্ধ করিয়া রাখিতে তিনি আর সাহস করিলেন না।

নীহারও যেন সেই খাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে অতলস্পর্শী গভীরতা, পিছন হইতে সামান্য আঘাত পাইলেই নিশ্চিত মৃত্যু, অথচ অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আজ আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। এক একবার মনে হয় মাকে গিয়া অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাটুকু খুলিয়া নিঃসঙ্কোচ হয়, পর মুহূর্ত্তেই দ্বিধা আসিয়া কণ্ঠস্বরকে রোধ করিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়ায়। কানে কানে কহে পাগল, নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ঝাঁপ দিতে আছে?—অসহায়ের মত নিষ্ফল ক্রোধে নীহার ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে থাকে।

জগতকে তাহার চিনিতে বাকী নাই। ইহার ফল মৃত্যু—ইহাতে সংশয় নাই। মায়ের আশ্রয় হইতে সে চ্যুত হইবে, কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে না। আর ইহাই ত' স্বাভাবিক! কোথাকার কে এক অপরিচিত হঠাৎ আসিয়া নিজেকে সন্তানের পরিচয় দিয়া চালাইয়া দিতে চায়। লোকে শুনিয়া হাসিবে যে!

কিন্তু এ তিলে তিলে বিচ্ছেদও যে তাহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এ তাহার পক্ষে অসহ্য। মরিতে হয় মরিবে সে, তাহাতে ক্ষোভ নাই তাহার, দরকার হইলে জগতের বুক হইতে এক নিমেষে চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে।

নীহার স্থির করিয়া ফেলিল—আজ আর সংশয় নাই। নিজের আচরণ আজ সে নিঃসঙ্কোচে উন্মুক্ত করিবে সকলের সম্মুখে। ছাত্রীভবনের অভিমুখে সে দৃঢ়পদে আগাইয়া চলিতে লাগিল।

শীতের কুহেলীপূর্ণ আকাশকে বিদ্রূপ করিয়া কোথা হইতে একরাশ পেঁজা মেঘ জড়ো হইয়াছে। ঈশানের কোণ হইতে বাতাস উঠিয়াছে। ভাঙা চাঁদ বুঝি ঢাকা পড়িয়া যায়। এখুনিই হয়ত ঝম্ ঝম্ করিয়া জল আসিয়া পড়িবে। নীহার দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

পৌঁছিবামাত্র মা উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডলি সঙ্গে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া মা কহিলেন আয়!—

বাহিরের বারান্দা দিয়া চলিতে চলিতে রেখা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিলেন—আজ তোকে ডেকেছি একটা কথা বল্‌বার জন্যে, বল, সত্যি তার জবাব দিবি?

অবাক হইয়া নীহার বলিল—কোনদিন তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি মা?

মা কহিলেন—না হস্‌নি যে তা জানি। তাই বলে যে ভবিষ্যতেও হবি না তার কোন মানে আছে? একটা অনুরোধ করব, হয়ত তোর কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে। বল তবু রাখ্‌বি, যুক্তি তর্ক সব ঠেলে রেখে?

বিস্ময়ের সীমা ছিল না নীহারের। তবুও যথাসাধ্য সংযত হইয়া

## নীহারের মা

সে কহিল—আজ থাক মা, তোমাকে কিছু অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে আজ, এ আলোচনা অন্যদিন কোরো।

মা ব্যাকুল হইয়া দুইহাত বাড়াইয়া বাধা দিলেন—না, না। জবাব দে আমার কথার তুই—বল্ রাখবি—আমার গাঁ-ছুয়ে। মায়ের পা স্পর্শ করিয়া নীহার কহিল—প্রতিজ্ঞা করিও না মা, অস্বাভাবিক হলেও, যদি অন্যায় না হয় আমি রাখ্‌ব?

মা আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—ডলুকে আমি তোর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই নীহার।

সম্মুখে পথ চলিতে হঠাৎ সাপ দেখিলে মানুষ যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে নীহার বেদনায় নীল হইয়া গেল, কোন কথা কহিবার মত শক্তিও রহিল না তাহার। এতবড় বিস্ময় তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। করুণ হাসিয়া সে জবাব দিল—ও কথা আর কোন দিন তুলো না মা? হয়ত শুনে ব্যথা পেলে,—কিন্তু আশ্চর্য্য যা হবে তাও কম নয় মা। ভাই বোনে বিয়ে হয় কখন!

কোন কথা শুনিবার মত অবস্থা মায়ের ছিল না। নীহার যে তাহাকে এতখানি আঘাত করিতে পারে তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাই আকস্মিক আঘাত তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিল। উষ্ণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—ও সব বাজে কথা রাখ নীহার। এতদিন আমাকে ঠকিয়ে, লুকিয়ে একজনের ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছ,—এই তোমার মাতৃভক্তি? ওসব কোন কথা আমি শুনতে চাই না, এ তোকে করতেই হবে। এত বড় আশায় ঘা পড়লে আমি পাগল হয়ে যাব নীহার, বল্ তুই রাখ্‌বি আমার কথা? আবেগ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ধৈর্য্যহীন করিয়া তুলিয়াছিল।

## নীহারের মা

বাহিরে দাঁড়াইয়া রেখার কেমন আশঙ্কা হইতে লাগিল। আর দাঁড়াইয়া শুনিবার মত সাহস হইল না তাহার। ছুটিয়া সে নীচে দিদির কাছে নামিয়া গেল।

মায়ের সব কথা নীহারের কানে পৌছায় নাই। অবাক হইয়া সে ভাবিতেছিল, ভগবানের এ কি বিচিত্র খেলা! আমার না বলা কথা আজ এমন অতর্কিতে প্রকাশ করিতে হইবে?

অকস্মাৎ মায়ের চমক ভাঙিল। নীহার বলিতেছে—অনেকদিন আগে এক রাত্রির কথা স্মরণ হয় মা,—যে রাত্রে তোমার প্রথম শিশু ভূমিষ্ঠ হয়!

—হয়। কিন্তু এ সব কথা কেন? মা নীহারের ব্যবহারে অবাক হইয়া গেলেন।

সামান্য ইতস্ততঃ করিয়া নীহার জবাব দিল—আমিই তোমার সেই প্রথম সন্তান!

সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও মা বোধ করি এত বিস্মিত হইতেন না। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন—আমার প্রথম সন্তান,—তুই নীহার!—আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না—কিন্তু সে ত' মৃত?

জোর দিয়া নীহার কহিয়া উঠিল—না, না মৃত নয়। চেয়ে দেখ আমিই তোমার সেই মৃত্যুঞ্জয়। তোমাদের দেওয়া মরণকে নিঃশব্দে জয় করে আবার ফিরে এসেছি।

মা যেন এত সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। অসহ্য আনন্দে তাঁহার দুই চক্ষু বুজিয়া আসিল। নীহার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল—চোখ খুলে, আমার মুখের দিকে চাও মা। চেয়ে দেখ, এ দেহ তোমারই রক্ত দিয়ে তিলে তিলে তৈরী হয়েছে।

## নীহারের মা

মায়ের দুই চোখে আনন্দের বান ডাকিয়াছে। থর থর করিয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন—ঝোড়ো বাতাস-লাগা লতার মত। এখনই হয়ত সংজ্ঞা হারাইবেন। নীহার দুই সবল বাহুতে মায়ের বাহু চাপিয়া ধরিল—মা ?

ধরিত্রীময়ী সংযত হইলেন—কিরে ? পরেই উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন ওরে, তোকে যে আমি অনেক আঘাত করেছি, অনেক দুঃখ দিয়েছি! কেন তুই জানাস্‌নি আমাকে ? আমাকে ক্ষমা কর তুই নীহার !

ম্লান হাসিয়া নীহার বলিল—কিসের ক্ষমা, মা ? অত কাতর হ'চ্ছ কেন তুমি, আমাকে চিন্‌তে না পারা তো তোমার অপরাধ নয়। মা যেন এ বিরহ আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। নীহারের মাথা তাঁহার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন তিনি, আমাকে তুই ক্ষমা কর নীহার। মা হয়ে মহাপাতকির কাজ করেছি আমি। এ অপরাধের শেষ নেই আমার।

মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া নীহার অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল মা, মাগো !

—কিরে ?—ওরে এ আনন্দ যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না ! ওরে আমি আজ কি ফিরে পেলাম ?

নীহারের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল অত উতলা হয়ো না মা। তোমার তুলনায় আমি আজ অনেক বড় জিনিষ ফিরে পেয়েছি, আমার আজন্মের সাধনা আজ সফল হয়েছে। তুমি ত' জান্‌তে না যে এই হতভাগাটি তোমারই ছেলে; কিন্তু আমি যেদিন থেকে জানলুম, সেদিন থেকে আমি খাওয়া ভুলেছি, ঘুম—আমার চোখ ছেড়েছে। জীবনে প্রথম আজ ভাল করে ঘুমুব মা। একটা জিনিষ দেখ মা, বলিয়া—সন্ন্যাসীর

দেওয়া ভুর্জ্জপত্রখানি সে মায়ের হাতে তুলিয়া দিল। পড়িয়া মায়ের চোখের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। একেবারে নীহারকে দুই হাতে আকর্ষণ করিয়া সবলে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

শিশুর মত নীহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মা একটু শান্ত হইলে নীহার বলিল তারপরেও কথা আছে মা।

সে কথাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়!

মা আকুলভাবে নীহারের মুখের পানে চাহিলেন।

তুমি মা বিশ্বাস করলে আমি তোমার ছেলে, আমিও মানলুম তুমি আমার মা। কিন্তু এর পরেও বাকী যারা রইল তাদের—

মা চেঁচাইয়া উঠিলেন—বাইরের কথা বল্‌ছিস্ কার?—তোর বাবার? না বিশ্বাস করলে আমি হাতে পায়ে ধরব। বল্‌বো ওগো তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি ত' বুঝ্‌বে না মা হওয়ার কি জ্বালা। দশমাস দশদিন পেটে ধরে প্রতিদিন ত' আমার মত প্রতীক্ষা করে কাটাওনি। তুমি পুরুষ, থাকো বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে; তুমি স্নেহের কদর বুঝ্‌বে কতটুকু। তাতেও যদি পাষাণ প্রাণ না গলে ওঁর পায়ে মাথা খুঁড়বো আমি। তবুও তোকে আর হারাতে পারব না।

সান্ত্বনা দিয়া নীহার বলিল—কি দরকার মা! তুমি জান্‌লে, আমি জানলুম, নাই বা কেউ জানলো আর; আমরা যেমন আছি থাক্‌বো। মা বুকের মধ্যে নীহারকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না, না, না, কোন ছলেই হারাতে পারব না আমি তোকে! বুকের ধনকে একবার যখন ফিরে পেয়েছি, আর বাইরে কিছুতেই যেতে দেব না তাকে।

* * * *

# নীহারের মা

রেখা ছুটিয়া আসিয়া ডলিকে জড়াইয়া ধরিল—দিদি! ওপরে কি কাণ্ড হচ্ছে—চল্ চল্ দেখ্‌বি চল্!

অবাক হইয়া ডলি বলিল—কী হয়েছে রে—

—মাষ্টার মশাই আমাদের দাদা হয়।

ডলি বিশ্বাস করিতে পারিল না। কহিল—সত্যি!

রেখা বলিল—ভগবান যেন তাই করেন দিদি। মাষ্টারমশাইকে আমরা যেন ভাই বলে মেনে নিতে পারি।

খানিকটা থামিয়া রেখা আবার বলিল—মাষ্টারমশাই ত' আমাদের আপনার কেউ ছিলেন না, সেইজন্যেই মা তাঁকে তোমায় দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। তাতে কিন্তু খুব মজা হতো দিদি। কিন্তু ভাই মাষ্টার-মশাই দিলেন সব উল্টে। বল্‌লেন কিনা—"ভাই বোনে কি বিয়ে হয় মা?" আমি ত' কিছুই বুঝতে পারলাম না। মা চেঁচিয়ে উঠলেন। মাষ্টারমশায় রেগে কি সব বল্‌তে লাগলেন। আমি ত' ভয়ে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

ডলি রেখার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। কোনো কথাই সে বলিল না। নীহারকে সে ভালবাসিত। বোন যেমন ভাইকে ভালবাসে। ইহার মধ্যে আর কিছুই ছিল না। তাহার সহিত নীহারের বিবাহের কথায় সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। এমন কথা সে কখনও কল্পনা করে নাই। নীহারের যে মূর্ত্তিকে এতদিন সে গোপনে পূজা করিয়াছে, তাহাতে যেন আজ মলিনতা পড়িয়া গেল।

হঠাৎ মায়ের ডাকে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি তাহারা মায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

মা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওরে শুনেছিস্ তোরা,

## নীহারের মা

এতদিন তোরা যাঁকে মাষ্টারমশাই বলে জানতিস, সে তোদের—আপন ভাই।—মা আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রেখা ও ডলি উদভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া তাহারা নীহারকে প্রণাম করিল। তাহাকে প্রণাম করিতে যাইয়া ডলি যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এমন সময় অনিলবাবু আসিলেন।

একটু বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন—কি গো ব্যাপার কি তোমাদের? আগ্রহের সহিত মা কহিলেন—ব্যাপার আর কি? এই নীহারের কথা বলছি—

নীহার সেখান হইতে সরিয়া গেল।

অনিলবাবু হাসিয়া বলিলেন—আবার নীহারের কথা! তুমি দেখ্‌ছি—পাগল হয়ে যাবে—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ পাগল ত' হবই। এমন ব্যাপার হলে সবাই পাগল হয়। এটার দিকে চেয়ে ছাখ তুমিও পাগল হয়ে যাবে। ধরিত্রীময়ী অনিলবাবুর হাতে একটি জিনিষ দিলেন।

সামনে বাজ পড়িলেও বোধহয় তিনি বিস্মিত হইতেন না। সুদূর অতীতের একটী দিন যেন একনিমেষে তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অতীতের সেই ঘটনাটি আজ তাঁহার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এও কি সম্ভব! একে একে সমস্তই তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িয়া গেল এক বর্ষণমুখর রাত্রে তিনি তাঁহার মৃতশিশুটিকে প্রসূতির অজ্ঞাতসারে পথে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। বহুদিনের স্মৃতি ঠেলিয়া আজ সেই শিশুটি তাঁহার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার বুক ঠেলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মানুষ

জানিয়া শুনিয়াও ভুল করিয়া বসে। অনিলবাবুও তাহাই করিলেন। নীহারের কুষ্ঠিপত্র হইতে সমস্ত জানিতে পারিয়াও তিনি ভুল করিলেন। ভাবিলেন—এ সব মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। যে শিশুকে তিনি পথে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এতদিন পরে হঠাৎ বাঁচিয়া ফিরিয়া আসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এ যে অবিশ্বাস্য!

—কি ভাবচ!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিলবাবু বলিলেন—ভাবছি ধরিত্রী এ কখনও সত্যি নয়।

ধরিত্রীময়ী ঈষৎ জ্বলিয়া উঠিলেন—কি বলচ তুমি! সন্ন্যেসীর দেওয়া এই কুষ্ঠিপত্র কি মিথ্যে হতে পারে!

পারে ধরিত্রী পারে! স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষের অসম্ভব কিছুই নেই—

ধরিত্রীময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না। নীহারের সম্বন্ধে এতবড় কথা যে কেহ বলিতে পারে এধারণা তাঁহার ছিল না।

হাসিয়া অনিলবাবু বলিলেন—তোমরা মেয়ে মানুষ। ওসব তোমরা কি বোঝ বলত? শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললেই হয়ে গেল! সংসারে বাস করতে গেলে কতদিক ভেবে কাজ করতে হয় জান?

ধরিত্রীময়ী রুষ্ট হইয়া কহিলেন—তোমরা কি মনে কর মেয়েরা মানুষ নয়,—না তাদের বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে নেই?

ধরিত্রীময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অনিলবাবু হাসিলেন—তোমাদের আমি বুঝতে পারিনে ধরিত্রী। একটা অজ্ঞাত অপরিচিত পথের ছেলে সে হঠাৎ কেমন করে তোমার

আপন হয়ে উঠ্‌ল সেইটেই আমার বুদ্ধির অগম্য, তোমরা ঠিক মানুষও নও, ঠিক মানুষেরও বাইরে নয়।—খানিকটা থামিয়া অনিলবাবু বলিলেন—এক কাজ কর। নীহারকে বলো সেই সন্ন্যাসীকে নিয়ে আস্‌তে। সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে।

ধরিত্রীময়ী স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন—বেশ তাই হোক।

অনিলবাবু নীহারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কল্পনাথকে পাঠাইয়া দিলেন।

ধরিত্রীময়ীর অন্তরে ঝড় উঠিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র অন্তর ইহাতে দুলিয়া উঠিয়াছে। যাহাকে তিনি একদিন আপনার অজ্ঞাতসারে হারাইয়াছিলেন, তাহাকে আকস্মিক পাওয়ার ভিতর যে প্রচণ্ড আঘাত আছে, যে বিপুল আনন্দ আছে, তাহা তাঁহাকে আজ বিচারবুদ্ধিহীন করিয়া তুলিয়াছে। সংসারে বাস করিতে গেলে যে যুক্তি, তর্ক ও আইনের দ্বারা মানুষকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়, এ ধারণা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার অন্তর বলিয়াছে যাহাকে আপন করিয়া লওয়া যায় তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ঠকিতে হয়। এত সব বুঝিয়াও ধরিত্রীময়ী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামীর কথা উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন নীহারের জন্য যে দুঃখ তিনি আজ পাইয়াছেন, এ দুঃখ অপরে তাঁহাকে দেয় নাই, তিনি নিজেই ইহাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন!

—মা।

ধরিত্রময়ী চমকাইয়া উঠিলেন—কিরে কল্পনাথ, গিয়েছিলি? —হ্যাঁ মা। মাষ্টারবাবু এখনও বাড়ী আসেন নি।

## নীহারের মা

চিন্তিত হইয়া ধরিত্রীময়ী বলিলেন—বাড়ী আসেন নি?

—না মা।—

আচ্ছা যা তুই।

কল্পনাথ চলিয়া গেল।

ধরিত্রীময়ীর নিকট হইতে বাহির হইয়া নীহার বাড়ী যায় নাই। খেয়ালের বসে হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া, কখন যে সে শ্মশান ঘাটে আসিয়া বসিয়াছে সে খেয়াল তাহার নাই।

—সন্ধ্যা নামিয়া পড়িয়াছে। দিগন্তের রক্তরশ্মি গঙ্গার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে—কে যেন গঙ্গার বুকে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। পাশে শ্মশানের চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আবহাওয়ায় যেন চাপা কান্নার সুর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নীহার আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুনের শিখা,—মাটির মোহ ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধদিগন্তে তাহার বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। সমস্ত কিছুকেই যেন সে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়। মানুষের নীচতা, সংকীর্ণতা ও সন্দেহকে যেন সে এখনই পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিবে!

—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

শ্মশানের পোড়া গন্ধ আসিয়া নাক ঝাঁঝাইয়া দিতেছে।

নীহার একদৃষ্টে চাহিয়া আছে শ্মশানের দিকে। মন তাহার আজ থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, দুই চক্ষু বাষ্পাকুল।

—কি বাঁচিয়া থাকে মানুষের! কিছুই না। পৃথিবীতে স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই বাঁচিয়া থাকে না। সেই স্মৃতিটুকুই মানুষকে সজীব করিয়া রাখে।

# নীহারের মা

নীহার ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।—একি সৃষ্টির বিধান! এমন যে সুন্দর পৃথিবী, ইহার ভিতর এমন কেন হয়? একজন তিলে তিলে পুড়িয়া মরিতেছে, আর একজন তিলে তিলে জীবনকে উপভোগ করিয়া লইতেছে। একজনের জীবন পূর্ণ, আর একজনের জীবন বিরাট আকাশের মত শূন্য!

স্থির দৃষ্টি দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া নীহার আর সেখানে বসিতে পারিল না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

রাত অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।—

নীহারের অবসন্ন মনটা বিষাদের অশ্রুমাখা আবরণে অনেকক্ষণ ভিজিয়াছিল, তাহা লইয়াই সে উঠিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া সোজা সে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

নিদ্রায় চোখ তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে।

—মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সম্মুখে।—স্নিগ্ধ কমনীয়, অপরূপ জ্যোতি সম্পন্ন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! ইহার বুঝি আর তুলনা নাই! নীহার বিস্মিত হইল। মা, মা! এখানে,—এত অধিক রাত্রে একাকী। উত্তেজনায় তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া সে ডাকিতে গেল, গলা হইতে স্বর ফুটিল না। মা হাসিয়া উঠিলেন—ভয় নেই নীহার। আর তোকে কাছ-ছাড়া করব না বাছা। ওরে আমার পাগল ছেলে, তোর সব অভিমান অন্তরের সমস্ত জ্বালা ধুয়ে মুছে দে—ওরে তোর সত্যিকার পরিচয় আজ যে আমি পেয়েছি।—তোর সমস্ত ব্যথা, বেদনা আজ রক্ত গোলাপ হয়ে ফুটে উঠ্‌বে, তোর এই দীর্ঘ বৎসরের সহিষ্ণুতা আজ জয়যুক্ত হবে, তোর দুর্ভিক্ষে ভরা মন আজ ফলে শস্যে কানায় কানায় উপ্‌ছে পড়বে। ওরে তুই ফিরে আয়। আমার অভিমানী ছেলে ছুটে আয় আমার কোলে—মায়ের

স্বর যেন তীব্র আর্ত্তনাদের মত শুনাইল। চমকাইয়া নীহার জাগিয়া উঠিল।

হায় রে কোথায় সেই মুর্ত্তি! সমস্তই স্বপ্ন! অন্ধকার ঘর যেন নিষ্ঠুর উপহাসে নীহারকে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গাল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

*  *  *

অনেক যুক্তিতর্কের পর নীহারকে সত্যই ফিরিতে হইল ভগ্নোৎসাহে—বিফল মনোরথে। এতগুলো প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও পিতার নিকট পুত্রের পরিচয় অবিশ্বাস্যই রহিয়া গেল। তাই পিতার আজ্ঞামত নীহারকে প্রমাণ স্বরূপ সেই সন্ন্যাসীকে আনিতে হইবে। সন্ন্যাসীকে আনিবার ভার তাহারই উপর পড়িয়াছে।

ছাত্রীভবন হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আর একটিবার সে মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া নীহার বলিল—বিদায় নিতে এসেছি মা। তোমাকে অনেক জ্বালাতন, তোমার ওপর অনেক অত্যাচার করে গেলাম মা। আমাকে মাপ কোরো। আশীর্ব্বাদ করো মা যেন সফল হয়ে ফিরে আস্‌তে পারি—অভিমানে নীহারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর সে বলিতে পারিল না। ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। নিশ্চল পাষাণের মত ধরিত্রীময়ী দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন তিনি তাঁর অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন!

—উদ্দাম ব্যথায় নীহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পাগলের মত সে ছুটিয়া চলিল। মাকে লইয়া ঘর বাঁধিবার যে স্বপ্ন এতদিন তাহার মনের আকাশকে রঙে রঙে রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহা আগুনের রঙে

ফাটিয়া পড়িয়া চতুর্দ্দিকে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, বিশ্বসংসার তাহাতে বুঝি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

বিরাট অভিমান আজ তাহার বুকের মাঝে ফেনাইয়া উঠিতেছে। এতগুলি প্রমাণ দেখাইয়াও তাহার উপর বিশ্বাস হইল না। সে কি তবে এতদিন মিছামিছি অসত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার স্বপ্নের সৌধকে গড়িয়া তুলিয়াছে? তাহা কি এতবড় ফাঁকি! তাহা কি শুধুই কল্পনা, সত্যের এতটুকু ছোঁয়াচও কি তাহাতে ছিল না?

সমস্ত পৃথিবী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাক। যাক্ সব রসাতলে। জীবনের ছন্নছাড়া গতিকে সে সংযমের বাঁধনে বাঁধিবেই। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও সে হটিয়া আসিবে না।

—মৃত্যু! সে তো চিরদিনের বন্ধু! তাহাকে সে ভয় করে না। নীহারের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। ভাবিতে আর সে পারে না। ভাবিতে গেলেই মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া ওঠে, চোখদুটি ঝাপসা হইয়া যায়।

অবসন্ন মন, ক্লান্ত দেহ, জীবনের প্রয়োজন যেন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

দুপুরের খররৌদ্র মাথা ঝাঁঝাইয়া দিতেছে। পায়ে একটা ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, টানিতে টানিতে সে চলিয়াছে।

সমস্ত উদ্যম যেন তাহার নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে।

নীহার দাঁড়াইয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না!

ইহার নিকট সমস্ত দেনাপাওনা চুকাইয়া আজ সে নিঃস্ব হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িবে।

## নীহারের মা

ধর্ম্ম, সত্য, কর্ত্তব্য, সমাজ—নীহার পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। ইহাদের সঙ্গে করিয়া সে পৃথিবীতে আসে নাই, আজ যাইবার বেলায় ইহাদের পায়ে নমস্কার জানাইয়া সে সরিয়া পড়িবে।

নীহার সরাসরি জ্যোৎস্নার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জ্যোৎস্না—

জ্যোৎস্না চমকাইয়া উঠিল—কে?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নীহারকে সামনে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল—তুমি! স্থির দৃষ্টিতে সে খানিকক্ষণ নীহারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিল—তুমি এমন সময়ে?

ম্লান হাসিয়া নীহার বলিল—খুব অসময়ে এসে পড়েছি, না?

জ্যোৎস্না হাসিয়া উঠিল—আমি কি তাই বলেচি না কি—

—ঠিকই বলেছ তুমি জ্যোৎস্না। বড় অসময়ে এসেছি।

নীহারের মুখের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্না ভয় পাইয়া গেল।

উৎকণ্ঠিত হইয়া সে বলিল—কি হয়েছে তোমার? এমন করে কথা বল্‌ছ কেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

নীহারের মুখ বেদনায় কঠিন হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কহিল—তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেচি জ্যোৎস্না—

—কয়েকটি মুহূর্ত্ত স্তব্ধ।— জ্যোৎস্না সহসা বুঝিতে পারিল না।

ব্যাকুল হইয়া সে বলিল—ওগো তোমার পায়ে পড়ি। খুলে বল সব কথা—

নীহার আবার হাসিল। অন্তরের সমস্ত বেদনা নিঙড়াইয়া যেন সে বাহির হইতেছে।

## নীহারের মা

—মায়ের স্নেহের স্পর্শে, যে জীবন আমার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার ভেতর আজ সংশয় এসে ঢুকেছে জ্যোৎস্না। পূর্ণতা আজ বিরাট শূন্যতার রূপান্তরিত হতে চলেছে। সন্দেহের ছায়াপাতে, ব্যর্থতার আত্মগ্লানিতে ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আজ আমি পরাজিত। সাধনার পথ হতে আমি কক্ষচ্যুত—বাঁচার আকর্ষণ আমার ফুরিয়ে এসেছে। একদিন তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে জ্যোৎস্না, তোমার সে ঋণ শোধ হবার নয়। আজ আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও জ্যোৎস্না। যদি জয়যুক্ত হয়ে ফিরে আস্তে পারি, সে ঋণ আমি জীবন দিয়ে শোধ করব—

উত্তেজনায় নীহার কাঁপিতেছে। এই কয়টি কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া অবশ হইয়া সে সামনের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। কিসের এক আবেশে চোখ দুটি তাহার বুজিয়া আসিল।......

স্থানুর মত জ্যোৎস্না দাঁড়াইয়া রহিল। এতবড় আঘাতে সে অচল হইয়া গিয়াছে।

খানিকক্ষণ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া নীহার সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—এ আমি জানি জ্যোৎস্না. কোন জিনিষ বেশী উঁচু হলে সে ভেঙ্গে পড়ে। আমার স্বপ্ন অতিরিক্ত হয়েছিল তাই আজ সে বাতাসে মিশিয়ে গেছে—নীহার থামিল। খানিকপরে সে আবার বলিল—মনকে আমি শক্ত করে নিয়েছি এর জন্যে আর আমি কাঁদব না, একে জয় করবার রাস্তা আমি খুঁজে দেখ্‌ব। তুমি আমায় বিদায় দাও—

জ্যোৎস্নার চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল।

—কি বল্‌ছ তুমি? কোথায় যাবে? তুমি গেলে আমি বাঁচব কেমন করে! ওগো সত্যই যদি তুমি যাও ত' আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

একদিন তো তুমি আমায় বলেছিলে—সময় এলে আমায় তোমার

সাথী করে নেবে। সে সময় কি আজও আসে নি?

—না জ্যোৎস্না, আজও আসে নি। আজও আমার জীবনের কক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়নি। চেয়ে দেখ, মেঘে মেঘে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে। এখনই হয়ত ঝড়ের অসহ্য গতিবেগ আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে যাবে।—তখন তোমায় নিয়ে দাঁড়াব কোথা জ্যোৎস্না?

—জ্যোৎস্নার মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।—অনেক কথা তাহার বলিবার ছিল। কথায় কথায় অন্তর তাহার কাঁপিয়া উঠিতেছে তবুও একটি কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। যেন গলা টিপিয়া সে তাহার আবেগকে পিষিয়া মারিতেছে। শুধু সারা অঙ্গ তাহার কাঁপিয়া উঠিল, গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নিশ্চল পাষাণের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীহার খানিকক্ষণ জ্যোৎস্নার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া জ্যোৎস্নার মাথাটি নীহার তাহার বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিল। এ অভিজ্ঞতা জ্যোৎস্নার কাছে নূতন। এ-যে বড় আকস্মিক। জ্যোৎস্না ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। অসীম নির্ভরতায় সে আপনাকে উজাড় করিয়া দিল। আনন্দের আবেগে সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

নীহার তাহাকে ভালবাসে—সত্যই ভালবাসে!......

ধীরে ধীরে নীহার বলিল—জ্যোৎস্না, আজ আমি চলেছি জীবনের শেষ কিনারায়। সে এক ধূসর মরুভূমি! শ্যামলতা সেখান হতে কেঁদে বিদায় নিয়েছে। সেই পথেই আজ আমায় চল্‌তে হবে। কেন জান? সে শুধু আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বয়ে বেড়াবার জন্যে। আজ আমায় ছেড়ে দাও জ্যোৎস্না। আমি আস্‌ব—ফিরে আস্‌ব একদিন। জীবনের সেই শুভমুহূর্ত্তে এসে তোমার আমার অনুরাগসিক্ত জীবনে বাসরঘর সৃষ্টি

করব। শুধু এই সময় টুকু তুমি সহিষ্ণু হও। চোখের জলে আমার যাত্রাপথকে দুর্গম করে তুলো না। এ আমার মিনতি জ্যোৎস্না।

কিন্তু হঠাৎ নীহারের গলাটা কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল,—কিন্তু যদি ফিরে আস্‌তে না পারি জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না অস্থির হইয়া কহিল—ওগো অমন কথা বোলো না। আমি পারব না শুন্‌তে। না না ওসব অমঙ্গলে কথা।

নীহার হাসিল।

—যদি ফিরে না আসি জ্যোৎস্না, তুমি বিয়ে করো। হয়ত তাতে তুমি সুখী হবে।

জ্যোৎস্নার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নীহার আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। এক প্রকার ছুটিয়াই রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। ফিরিয়া সে একবার জ্যোৎস্নার বাড়ীর দিকে চাহিল। অসহ্য বেদনায় বুকের ভেতরটা তখন তার কেমন যেন করিতেছে।

—নীহার আগাইয়া চলিল।

* * *

## ১৩

নীহার চলিয়া গেলে ধরিত্রীময়ী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সারাদিন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চোখ চাহিয়া এদিক ওদিক ব্যাকুল নেত্রে তিনি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রেখা ও ডলি তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া আছে।

ধরিত্রীময়ী যে হঠাৎ কেন এরূপ হইয়া গেলেন অনিলবাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা ত ফিরাইবার উপায় নাই।

ঔষধে, পথ্যে, ডাক্তারে ঘর ভর্ত্তি। ধরিত্রীময়ীর জ্ঞান মুহূর্ত্তে হইতেছে আবার তিনি অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। এমনি করিয়া সে রাত্রিটি কাটিল। পরদিন প্রভাতে মার জ্ঞান বেশ ফিরিয়া আসিল। ডলি মাথার কাছে বসিয়া রাত্রি জাগরণের অবসাদ হেতু ঢুলিতেছিল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া মা প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে ডল্, নীহার ফিরে এসেছে ?

নিভিয়া গিয়া ডলি বলিল—নাতো মা।

একটি দীর্ঘশ্বাস ধরিত্রীময়ীর বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। এমন সময় অনিলবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ধরিত্রীময়ীকে সুস্থ দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

তিনি বলিলেন—দেখ, মনটা আজ আমার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছে।

কোন কাজেই যেন জোর পাচ্ছি না, সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ধরিত্রীময়ী চুপ করিয়া রহিলেন।

অনিলবাবু আবার বলিলেন—আমি অন্যায় করেছি ধরিত্রী। তাকে অবিশ্বাস করে আমি নিজের কাছে নীচু হয়ে গেছি। আমার মন তাই আজ অনুশোচনায় ভরে উঠেছে ধরিত্রী—

অনিলবাবু ঘরের ভিতর অস্থির হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

কল্পনাথ আসিয়া খবর দিল, কে এক সাধু আসিয়াছেন তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য।

অনিলবাবু ও ধরিত্রীময়ী তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

—আপনাদের মঙ্গল হক বাবুজী—সাধু হাসিয়া বলিলেন।

ধরিত্রীময়ী পায়ের ধুলা লইলেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া সাধু বলিলেন—তোমার কল্যাণ হোক মা।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সাধু বলিলেন—আপনারা ভয়ানক ভুল করেছেন বাবুজী। তারপর ধরিত্রীময়ীর পানে ফিরিয়া বলিলেন—নিজের ছেলেকে তুমি চিনতে পারলে না মা!

ধরিত্রীময়ীর চোখদুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

বিস্মিত হইয়া অনিলবাবু বলিলেন—আপনি এসব জানলেন কেমন করে?

উত্তরে সাধু শুধু ইষৎ হাসিলেন।

সাধু বলিলেন—যে ভুল আপনারা করেছেন, তার জন্যে আপনাদের অনুতাপ করতে হবে।

অনিলবাবু নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

# নীহারের মা

সাধু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। যেমন আকস্মিক তিনি আসিয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎই তিনি চলিয়া গেলেন।

শুধু ধরিত্রীময়ীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। অনিলবাবুর বেদনাপাণ্ডুর মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

বিশ্বের সমস্ত বেদনা বুকের মাঝে লইয়া নীহার জ্যোৎস্নার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

জানলার ধারে বসিয়া নীহারের ব্যথিত-দৃষ্টি সুদূর আকাশের মাঝে হারাইয়া গেল।

জীবনের প্রতি মোহ তাহার শেষ হইয়া আসিতেছে। আজ তাহার ছুটি, বাঁধনের গণ্ডী তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্নেহ, প্রেম, মায়া আজ আর তাহাকে ঘরের পানে টানিতে পারে না।

ট্রেন ছুটিয়া চলিতেছে উদ্দাম গতিতে।—দৃশ্যের পর দৃশ্য ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। বিগত জীবনে তাহাদের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। মানুষের মনে এই যে রঙের খেলা, এ এতই ক্ষণিকের! ক্ষণিকের জন্য সে তাহার মনকে কল্পনায় স্বপ্নে ভরাইয়া তোলে; আবার আকস্মিক ভাবেই সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

প্রভাতের আরক্ত সূর্য্যের যে রূপ, আকাশে যে বিচিত্র স্বপ্ন সমাবেশ, প্রকৃতির যে অপরূপ শ্যামলী মূর্ত্তি, এরাও ক্ষণিক। এরা শুধু মানুষের

মনে স্বপ্নের রেখা টানিয়া দেয়। ইহাদের সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে অনুতাপ করিতে হয়।—

এমনিই মানুষের মন!

রেখা……ডলি……মা……নীহারের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। ভুল করিয়াছিল সে—সত্য তাহারা কখনও নয়!

নীহার আর ভাবিতে পারিল না। চিন্তাকে সে যতই দূর করিতে চায় চিন্তা তাহাকে ততই ধীরে ধীরে পাইয়া বসে। বুকের মাঝে অসহ্য জ্বালা ধরিয়াছে তাহার। ক্লান্তির ভারে হয়ত সে এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। জীবনের বোঝা আর সে টানিয়া চলিতে পারে না।

নীহারের চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল। জানালার উপর মাথা রাখিয়া সে নির্জীবের মত বসিয়া রহিল।—

—কেমন করিয়া সে পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

—কি তাহার পরিচয়?

ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সে খেয়াল তাহার নাই। হঠাৎ চোখ খুলিয়া সে দেখিল গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কাশীতে; তাড়াতাড়ি সে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফরম ছাড়াইয়া সে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল—কেমন করিয়া সে সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? কাহাকেই বা সে চেনে এখানে?

নীহার চলিতে সুরু করিল।

সারাদিন দারুণ পরিশ্রমের পর সে সেই সন্ন্যাসীর আশ্রম খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু সেই আশ্রমে গিয়া শুনিল সন্ন্যাসী সেখানে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

নীহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে সেখানেই ধুকিতে ধুকিতে

বসিয়া পড়িল। যেটুকু আশা ও উত্তম আজও তাহার বাঁচিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। নীহার যেন একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছে!

তারপর সে এক সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিতে সুরু করিল। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, এখনই হয়ত সে তাহার ভিতর মিলাইয়া যাইবে। দুঃখে ক্ষোভে নীহার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষ্টেশনে আসিয়া সে পৌঁছিয়াছে। কলিকাতাগামী একখানা ট্রেনে নীহার চড়িয়া বসিল।

পৃথিবী বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে—রূপ, রস, গন্ধ—তাহাও আজ যন্ত্রণাদায়ক!

আবার ছুটিয়া চলিয়াছে ট্রেন—আপনার প্রাণের দুরন্ত আবেগে। ইহার সহিত নীহার নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না। গতির নেশা তাহারও ছিল একদিন, কিন্তু সে আজ আকাশ পথে প্রচণ্ড আবেগে চলিতে গিয়া কোন্ অজানা গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

গতি যেখানে শেষ হইয়াছে, মৃত্যু সেখানে তাহার আসন পাতিয়াছে; মৃত্যু তাহার রক্তে আজ নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু তাহার পিছনে আজ ছুটিয়া আসিতেছে, না সেই আজ তাহার পিছনে ধাওয়া করিতেছে? তাহাকে সে এড়াইয়া যাইতে পারিবে না, কেননা জীবনের প্রয়োজন তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে!

গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত, সুনীল আকাশ, ধরণীর শ্যামলী রূপ—আজ বড় রূঢ়, ভয়ঙ্কর; প্রলয়ে প্রভঞ্জনে আজ তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যাউক, মানুষকে যেন তাহারা আর কখনও প্রতারণা করিতে না পারে—!

# নীহারের মা

গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধায় নীহারের পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল। সামান্য খাবার কিনিয়া সে খাইল।

গাড়ী আবার ছুটিয়া চলিল।

নীহার তেমনি বসিয়া আছে পুতুলের মত। মাথা তাহার কেমন ঝিমাইয়া আসিতেছিল, সারা শরীরের ভিতর যেন পাক খাইতেছে। কিসের এক অসহ্য যন্ত্রণায় সারা দেহ তাহার কাঁপিয়া উঠিল, একি হইল তাহার! মৃত্যু কি নামিয়া আসিতেছে তাহার চোখে! নীহার হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় বেঞ্চের উপর সে লুটাইয়া পড়িল।

গলা দিয়া তাহার নামিয়া আসিল বমি, বমির পর বমি। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল বেলুড়ে। কামরার লোক ষ্টেশনমাষ্টারকে নীহারের অবস্থা জানাইল।

নীহার তখন একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথা তাহার তখনও পূর্ণমাত্রায় সজাগ। তখনও চিন্তার ভারে সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

ষ্টেশনমাষ্টার গাড়ীর ভিতর আসিয়া পুলিশের সাহায্যে ভীড় সরাইয়া নীহারের অসাড় দেহটাকে বাহির করিয়া দিলেন এবং গাড়ীতে করিয়া লইয়া গিয়া বেলুড়ের আশ্রমে পৌছাইয়া দিলেন।

সেবায় শুশ্রূষায় নীহারের জ্ঞান অল্প ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে মায়ের সেই দেবীমূর্ত্তি। সে যেন আবছা অন্ধকারের পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ভাল করিয়া চেনা যায় না। মন তাহার শান্ত হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকে সে সাদরে বরণ করিয়া লইবে।

## নীহারের মা

সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা নীহারের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। নীহার ক্ষীণ হাসিল—পরিচয় আমার নেই, আপনারা বৃথা চেষ্টা করবেন না। নীহার হাঁপাইয়া উঠিল।

সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। নীহারের পকেট খুঁজিয়া একখানি চিঠি বাহির করিলেন। তাহাতে অনিলবাবুর ঠিকানা লেখা ছিল।

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অনিলবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। নীহার আবার হাসিল। চোখ দুইটি তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, সারা দেহ স্তব্ধ শান্ত, যন্ত্রণার এতটুকু লক্ষণও নাই।

গঙ্গার কলধ্বনি নীহারের কানে আসিয়া সঙ্গীতের মত বাজিতেছে। বেলুড়ের আকাশ-ঠেকা মন্দিরের চূড়া তাহার সামনে যেন এক অজানা মায়ালোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। মৃত্যুর রথ তাহার ভিতর হইতেই যেন ছুটিয়া আসিতেছে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য। অসীম তৃপ্তিতে নীহারের সারা মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল।

গঙ্গার কলধ্বনি আজ কোন দেবলোকের সুরসৃষ্টি করিয়াছে, আজ কোন অজানার তীরে সে তাহার জীবনের সুরকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! সুর আজ নীহারকে পূর্ণ করিয়াছে, তাই আজ সে মুক্তি পাইয়াছে! অসহ্য আনন্দ !!···

* * *

নীহারের চিতা জ্বলিয়া উঠিল। চিতার আগুন ঊর্দ্ধদিগন্তে তাহার বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, যেন সে অসীমকে দুই হাতে আকড়াইয়া

ধরিতে চায়, যেন তাহার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অনন্তের আলোকের কণা মিশাইতে চায়!

চিতার সামনে পাষাণে বসিয়া পড়িয়াছেন ধরিত্রীময়ী। চোখ তাঁহার শুষ্ক, মুখ তাঁহার শান্ত। শুধু তাঁহার দেহটা মাঝে মাঝে কিসের এক অসহ্য আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সমস্ত পৃথিবী আজ তাঁহার চোখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, শুধু চিতার আগুন তাঁহার বুকের মাঝে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। এখনই মুছিয়া যাইবে পৃথিবীর অস্তিত্ব, শুধু বাঁচিয়া থাকিবে ঐ দুরন্ত চিতা আর এই শ্মশান।

ধরিত্রীময়ী তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন পাথরের মত নিশ্চল, নিঃসাড় দেহ—যেন মাটী দিয়া তৈরী, অনুভূতিহীন।

চিতার আগুন ঝিমাইয়া আসিল, রাত্রি আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল, —মুছিয়া দিল তাহার সমস্ত চিহ্ন!

—শেষ—